তবে এদিকেও আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, এটা বরফ গালানোর মত সহজ কর্ম নয়, নয় ভোজবাজির মত এক রাতেই ঘটে যাবার বিষয়। তাহলে তো বেশ মজাই হতো ; বরং সাধনা ও নিরলস প্রচেষ্টা এবং ত্যাগ ও কুরবানীর বিশাল ধূ ধূ প্রান্তর পাড়ি দিয়েই শুধু পৌঁছানো যেতে পারে স্বপ্নের সেই সবুজ জান্নাতে। আর তার উপরই নির্ভর করবে ইসলামের ভবিষ্যত অগ্রগতি এবং আপনাদের দেশের ভাগ্যের।

পরিশেষে যাঁরা এমন একটি মহতী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আমাকে কৃতার্থ করেছেন তাঁদের জন্য রইল আমার হৃদয়ের শুভ কামনা ও কল্যাণ প্রার্থনা এবং তাঁদের জন্যও যাঁরা এখানে আসার কষ্ট স্বীকার করে আমাকে বাধিত করেছেন।

আলিম ও সুধী সমাজের দায়িত্ব

(২২ জুলাই ৭৮ ইং ফয়সলাবাদ জামে মসজিদে প্রদত্ত ভাষণ। দেশের বিশিষ্ট উলামা, আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকবৃন্দ এবং সাহিত্য, সংবাদপত্র, ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অংগনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ইসলামী আইন গবেষণা পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য মাওলানা মুফতী সাইয়াহুদ্দীন কাকাখীল স্বাগত ভাষণ দান করেন।)

হামদ ও সালাতের পর

শ্রদ্ধেয় উলামায়ে কিরাম এবং দেশের বিভিন্ন মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত শিক্ষকবৃন্দ !

আপনাদের খিদমতে বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্ট কোন বক্তব্য পেশ করার পূর্বে একটি সংক্ষিপ্ত ও মৌলিক কথা পেশ করতে চাই।

আলিম ও সুধী সমাজের দায়িত্ব

বর্তমান সময়ে দেশের আলিম সমাজ, শিক্ষিত শ্রেণীর দায়িত্ব পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজের শীর্ষ পর্যায়ের মেধাবী, চিন্তাশীল ও

সুগভীর ধর্মীয় প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ যখন কোন আন্দোলন ও সংস্কার প্রচেষ্টার সাথে সংশ্লিষ্ট হন তখন সে আন্দোলন লাভ করে এক ব্যাপক, গভীর ও মযবুত বুনিয়াদ। সে আন্দোলন ও সংস্কার প্রচেষ্টা সম্পর্কে তখন এ আশাবাদ ব্যক্ত করা চলে যে, তা ভুলপথে পরিচালিত হবে না, সেখানে সাময়িক উত্তেজনা ও হুজুগের প্রাধান্য হবে না এবং তাতে সাধারণ জনতা-সুলভ বাচালতা স্থান পাবে না ; বরং এক মহান লক্ষ্যের পানে তা এগিয়ে যাবে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপে অবিচল গতিতে।

বর্তমান সময়ে ইসলামী বিশ্বে আলিম সমাজ, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত ইসলামী সংগঠন-গুলোর দায়িত্ব পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সব যুগেই সমাজ ও জাতির হাল ধরার দায়িত্ব তাদের উপরই ন্যস্ত ছিল। তবে বর্তমান সমস্যা-সংকুল ও সংকটাপন্ন সময়ের প্রেক্ষাপটে উপরিউক্ত দায়িত্বের পরিধি নিঃসন্দেহে অনেক বিস্তৃত হয়েছে। প্রতিকূল ঝড়-ঝাপটায় বিপর্যস্ত উম্মাহকে আজ তাঁদের সঠিক পথ-নির্দেশনা দিতে হবে। দীনী আন্দোলন ও সংস্কার প্রয়াসগুলোকে বিচ্যুতি ও সাময়িক উত্তেজনাপ্রসূত কর্মকাণ্ড থেকে রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে যেন সেগুলো সাধারণ মানুষের আস্থা হারিয়ে বুদ্বুদের মত মিলিয়ে না যায় ; বরং সেগুলোর শিকড় যেন প্রবিষ্ট হয় দীন ও শরীয়তের গভীরে।

মুসলিম শাসনামলে 'আলিম সমাজের অবদান

উমাইয়া ও আব্বাসী খিলাফতকালে ইসলামী উম্মাহ্‌র বরেণ্য 'আলিম ও মুজতাহিদগণ পৃষ্ঠপোষকতা না করলে ইসলাম আজ একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুবিন্যস্ত জীবন-বিধানরূপে বিদ্যমান থাকত না। দেশবিজয়ী বীরদের ভাগ্যেই সাধারণত ইতিহাসের প্রশংসা ও সুখ্যাতি জুটে থাকে। ইসলামী উম্মাহ্‌র বরেণ্য সেনাপতিবৃন্দ তথা তারিক বিন যিয়াদ, মুহাম্মদ বিন কাসিম, 'উকবা বিন নাফে' ও মূসা বিন নুসায়র প্রমুখের নাম ও কীর্তি ইতিহাসের পাতায় সূর্যালোকের মতই দেদীপ্যমান। কিন্তু বিজিত এলাকায় ইসলামের বুনিয়াদ মযবুত করার কাজে এবং আল্লাহ্‌র বিধান জারির ক্ষেত্র ও পরিবেশ সৃষ্টির কাজে যাঁরা নিজেদের সঁপে দিয়েছিলেন, ইসলামী শরীয়ত ও ফিকাহ্‌র আলোকে উদ্ভূত সমস্যার যুগোপযোগী সমাধান পেশ করার জন্য নিরলস দিন ও বিনিদ্র রাত কাটিয়েছেন, সময় ও পরিস্থিতির আলোকে শাসকবর্গকে পথ ও পন্থা

বাতলিয়েছেন—তাদের অবদান ও কুরবানীর কথা ইতিহাসের পাতায় খুব কমই স্থান পেয়েছে। অথচ এটা ধ্রুব সত্য যে, ইমাম, মুজতাহিদ ও মুহাদ্দিছগণ যদি সে যুগে তাদের মেহনত ও সাধনায় সামান্যতম কার্পণ্য করতেন, দেশবিজয়ী তরবারীর পেছনে পেছনে তাঁদের অসামান্য জ্ঞান ও মনীষা যদি আলো বিকিরণ না করত, দেশ পরিচালনাকারীদের পেছনে তাঁদের মেধা ও মস্তিষ্ক যদি সজাগ ও সক্রিয় না হ'ত, তাহলে দেশবিজয়ের সকল প্রচেষ্টাই হ'ত অর্থহীন। এমন কি বিজিত অঞ্চলগুলোই তখন হয়ে উঠত ইসলামী উম্মাহ্‌র গলার ফাঁস, আর আজ ইতিহাসের গতিধারাই হ'ত ভিন্ন।

মুসলমানদের পরাস্তকারী ইসলামের হাতে হলো পরাস্ত

উদাহরণস্বরূপ বর্বর তাতার জাতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বর্বর তাতারীরা এক সময় ইসলামী উম্মাহ্‌কে বিপর্যস্ত করে দিয়ে ছিল। অপ্রতিরোধ্য তাতারী সয়লাবের মুখে খড়কুটার ন্যায় ভেসে গিয়েছিল গোটা ইসলামী বিশ্ব। ভেংগে পড়েছিল তাহ্‌যীব ও তমদ্দুনের মেরুদণ্ড। তখনকার দুনিয়ায় মুসলমানদের মত হীন ও অপদস্থ আর কেউ ছিল না। বিভিন্ন যাদুঘরে রক্ষিত সে যুগের ভাস্কর্যসমূহে দেখা যায়ঃ ঘোড়ার লেজের সাথে বেঁধে দেওয়া হয়েছে কোন মুসলমানের দাড়ি আর কোন তাতারী সৈনিক হাঁকাচ্ছে সে ঘোড়া। দুনিয়ার আর সব জাতি তাদের চোখে মর্যাদার অধিকারী ছিল, কিন্তু মুসলমানদের কোন ইযযত ছিল না তাদের কাছে। বিশেষত মুসলিম সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মনীষার প্রাণকেন্দ্ররূপে পরিচিত অঞ্চলগুলোই ছিল তাতারী নির্যাতনের অধিক শিকার। কিন্তু ইতিহাসের চমকপ্রদ ঘটনা এই যে, যে তাতারীদের হাতে নির্মমভাবে লুন্ঠিত হয়েছিল মুসলিম উম্মাহ্‌র ইযযত, সেই বর্বর তাতারীরাই একদিন লুটিয়ে পড়ল ইসলামের পদপ্রান্তে। মুসলমানদের তলোয়ার যাদের পরাজিত করতে পারেনি—ইসলামী সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মনীষা তাদের জয় করে নিল অবলীলাক্রমে। এভাবে ইতিহাসের বুকে আরেকবার প্রমাণিত হল যে, মুসলমানরা রক্ষা করেনি ইসলামকে বরং ইসলামই মুসলমানদের রক্ষা করেছে বারবার। কিন্তু কিভাবে সম্ভব হয়েছিল ইতিহাসের সেই চমকপ্রদ পটপরিবর্তন ? ব্যাপার ছিল এই যে, তাতারীদের কাছে কোন জ্ঞানভাণ্ডার ছিল না, ছিল না কোন পরিশীলিত সভ্যতা, কোন সুবিন্যস্ত আইন ও বিধিমালা। উপজাতীয় জীবনে প্রচলিত কতিপয় সাদা-মাটা অলিখিত আইনকানুনই ছিল তাদের মূলধন। সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে তারা ছিল রিক্তহস্ত।

ফলে তারা প্রয়োজন অনুভব করল মুসলিম 'উলামা ও বিদ্বান মনীষীদের সাহায্য গ্রহণের। তাতারীদের দরবারে মুসলিম 'আলিমদের আসন গ্রহণের পর বিজেতাদের অন্তরে বিজিত জাতির অতুলনীয় জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, মনীষা, মেধা ও প্রতিভা ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি তাদের মোহিত করল। ফলে জাতিগতভাবেই তাতারীরা মুসলমান হয়ে গেল। মুসলমানরা ছিল বুদ্ধিজীবী, তাদের কাছে ছিল মেধা ও প্রতিভার অফুরন্ত উৎস, ছিল উন্নত সভ্যতা ও উদার সংস্কৃতি, আর ছিল আইন প্রণয়নের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং নাগরিক সমস্যা ও জটিলতা নিরসনের প্রখর বুদ্ধি। কাজেই তাতারীরা তাদের সহযোগিতা গ্রহণে বাধ্য হলো।

ইতিহাস দর্শনের এটা এক স্বীকৃত সত্য যে, যে সামরিক শক্তির পেছনে মেধা ও মস্তিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতা থাকে না, আইন প্রণয়নের যোগ্যতা ও সুসংহত প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা থাকে না, সে শক্তির বিজয় দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনা।

ইসলাম 'ইলমের ধর্ম

আধুনিক যুগে ইসলামী বিশ্বের 'আলিম সমাজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, শিক্ষকবৃন্দ, আইনবিদ, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উপর অর্পিত এক বিরাট দায়িত্ব এই যে, বিশ্ব জাতিবর্গের সামনে তাদের একথা তুলে ধরতে হবে যে, অজ্ঞতার অন্ধকার গর্ভ থেকে কিংবা সামরিক শক্তির ছত্রছায়ায় ইসলাম জন্মলাভ করেনি; বরং ইসলামের জন্ম হয়েছে আল্লাহ্‌র পরিচয় থেকে। ওয়াহী তথা ঐশীবাণী হচ্ছে তার উৎস। সুতরাং ইসলাম যুগের সকল চাহিদা মেটাতে পারে, পারে জীবন্ত সভ্যতার পথপ্রদর্শন করতে; বিচ্যুতি, অবক্ষয় ও ধ্বংসাত্মক পথ থেকে বাঁচাতে। মুসলিম উম্মাহ্‌র 'আলিম ও বুদ্ধিজীবী সমাজই শুধু ইসলামের এ ভাবমূর্তি তুলে ধরতে পারে বিশ্ব জাতিসমূহের দরবারে। এটা এক বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কাজ।

কোন ধর্ম কিংবা কোন জাতি সম্পর্কে যদি এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, জ্ঞান ও 'ইলমের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই তাহলে অস্ত্রের জোরে কোন ভূখণ্ডের উপর আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হলেও মেধা ও মানের জগতে সে জাতি তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে না কোন দিন। কেননা সে জাতি ও ধর্ম সম্পর্কে বিশ্ব এ ধারণা পোষণ করবে যে, বেঁচে থাকার জন্য এর

প্রয়োজন হলো অজ্ঞতার অন্ধকার। যতক্ষণ আঁধার আছে—ততক্ষণই এর অস্তিত্ব আছে। জ্ঞানের আলো ফুটে উঠার সাথে সাথে বিলুপ্ত হয়ে যাবে এর অস্তিত্ব, যেমন করে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মিলিয়ে যায় আঁধারের অস্তিত্ব। খৃস্টধর্মের বেলায় তাই ঘটেছিল। জ্ঞানের সাথে খৃস্টধর্মের সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি; বরং একটি নির্ভেজাল আত্মিক আন্দোলন ও সামাজিক বিপ্লবরূপে খৃস্টধর্ম আত্মপ্রকাশ করে। হযরত 'ঈসা (আ)-র সময়কাল পর্যন্ত তাঁর প্রিয় ব্যক্তিত্ব, পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল এ ধর্মের সহায়ক। কিন্তু পরবর্তীতে দীর্ঘকাল ধরে মেধাবী, প্রজ্ঞাবান ও দুরদর্শী ব্যক্তিবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা সে লাভ করতে সক্ষম হয়নি। এ অবস্থায় খৃস্টবাদ ইউরোপে পৌঁছলে জনমনে ব্যাপক-ভাবে এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, যুগ ও জীবনের সাথে তাল মেলাতে খৃস্টবাদ সক্ষম নয়। কাজেই জীবন থেকে নির্বাসন দিয়ে গীর্জার পরিসরে তাকে আবদ্ধ করা হোক।

খৃস্টধর্মে স্বতন্ত্র শরীয়ত ছিল না

ইউরোপ তখন অগ্রগতির পথে দ্রুত ধাবমান। নতুন উদ্যম ও নতুন শক্তিতে গোটা ইউরোপ তখন টগ্‌বগ্ করছে। বেঁচে থাকার সুতীব্র প্রতি-যোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এক ব্যাপক কর্মযজ্ঞে। অবস্থা এই ছিল যে, মুহূর্তের অসতর্কতা ইউরোপীয় জাতিবর্গের জন্য ডেকে আনতে পারত চরম ভাগ্য বিপর্যয়। ওদিকে খৃস্টধর্ম তখন সবেমাত্র শৈশব অতিক্রম করছে। সার্বিক বিন্যাস, যুগোপযোগী ব্যাখ্যা, জীবন জিজ্ঞাসার জওয়াব কিংবা সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিধি-বিধান কিছুই ছিল না তার কাছে; বরং সামাজিকভাবে আইনের ক্ষেত্রে তা ছিল য়াহূদী ধর্ম নির্ভর। য়াহূদী শরীয়তের বিচ্যুতি ও বিকৃতির সংস্কার ও সংশোধনই ছিল খৃস্টধর্মের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য। হযরত 'ঈসা (আ) নিজের কখনো স্বতন্ত্র শরীয়তের ঘোষণা দেন নি; বরং হযরত মূসা (আ)-র শরীয়তে আংশিক রদবদলের ঘোষণা দিয়েছিলেন মাত্র। পবিত্র কুরআনের ভাষায় য়াহূদীদের উদ্দেশ্যে হযরত 'ঈসা (আ)-র বক্তব্য ছিল এরূপ ঃ

"তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ (হারাম) কৃত কতক বিষয় ও বস্তু বৈধ ও হালাল করার উদ্দেশ্যেই আমার আগমন।" মোটকথা, য়াহূদী শরীয়তের আংশিক রদবদল ছাড়া স্বতন্ত্র কোন শরীয়ত খৃস্টধর্মের কাছে ছিলনা। মানবতায়

প্রেম, মানুষের প্রতি করুণা, নির্যাতিতের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি এবং ভূস্বামীদের শোষণ, হঠকারিতা ও অহংকারের বিরুদ্ধে শান্ত (অহিংস) প্রতি-বাদই ছিল খৃস্টধর্মের মূল শিক্ষা। এই রূপ ও আকৃতি নিয়ে খৃস্টধর্ম যখন ইউরোপের কর্মচঞ্চল ভূখণ্ডে এবং অগ্রগতির নেশায় বিভোর জাতিবর্গের জীবন প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হলো—তখন দিবালোকের মতই এ সত্য প্রকাশ পেয়ে গেল যে, পরিবর্তনশীল যুগের, গতিময় সমাজ জীবনের এবং শতধারায় উৎসরিত জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাথে দ্রুত তাল মিলিয়ে চলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে সময় খৃস্টান বিদ্বান সমাজের দায়িত্ব ছিল যুগের নিরিখে খৃস্ট ধর্মের উপযোগিতা প্রমাণ করা এবং ধর্মগ্রন্থ থেকে মূলনীতি আহরণ করে যুগ ও সমাজের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করা এবং জীবন সমস্যার পূর্ণাঙ্গ সমাধান পেশ করা। কিন্তু তারা তাদের এ দায়িত্ব পালন করেনি। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই খৃস্ট সমাজে দুটি বিভক্ত শ্রেণীর উদ্ভব হলো। শাসক সম্প্রদায় 'আকীদা ও বিশ্বাসের সীমা পর্যন্ত খৃস্টধর্মের অনুগত থাকল, কিন্তু বিধান প্রণয়ন ও রাষ্ট্রশাসনসহ জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে ধর্মকে নির্বাসন দিল। অন্যদিকে ধর্মপণ্ডিৎ তথা পুরোহিত সম্প্রদায় এর চরম বিরোধিতা শুরু করল। খুব জোরেশোরে তারা এ ধারণা প্রচার করা শুরু করল যে, মুক্তি ও পরিত্রাণ পেতে হলে জীবনের কোলাহল বর্জন করে বনে জঙ্গলে আশ্রয় নিতে হবে। দাম্পত্য জীবন বিসর্জন দিতে হবে। এমনকি নারীর ছায়াটুকু পর্যন্ত এড়িয়ে চলতে হবে। মূলত উভয় শ্রেণীই উপকারের পরিবর্তে খৃস্টধর্মের ক্ষতি সাধন করেছে। তার অন্তিম দশা তরান্বিত করেছে। শাসক সম্প্রদায় ধর্মের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয়ে পূর্ণ স্বেচ্ছাচারের সাথে সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামো গড়ার কাজে লেগে গেল। মানুষকে তারা পরিণত করল শাসক শ্রেণীর দাস-দাসীতে। অথচ এসব কর্মকাণ্ড ছিল খৃস্টধর্মের শিক্ষা ও আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ফলে মানুষের চোখে খৃস্টধর্ম হলো বিকৃত। খৃস্টীয় চতুর্থ শতকে সেন্ট পলের যুগ থেকে শুরু হয়ে আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে এ ধারা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইউরোপ সেই একই পথের যাত্রী। ফলে তিক্ততার চরম পর্যায়ে পৌঁছে গির্জার সাথে মানুষের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। রাষ্ট্র ও ধর্ম চিরদিনের জন্য পৃথক হয়ে গেল। এভাবে জীবনের বিস্তৃত অংগন থেকে সংকুচিত হতে হতে খৃস্টধর্ম আজ এসে ঠেকেছে শেষ বিন্দুতে।

ইসলামের সাথে 'ইল্‌মের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য

আল্লাহ্‌ পাকের সীমাহীন করুণা এই যে, ইসলামী জগত এ ধরনের বিচ্যুতি ও বিভ্রান্তির শিকার হয়নি। কেননা ইসলাম ও 'ইল্‌মের মাঝে ওৎপ্রোত সম্পর্ক ছিল হেরা গুহায় ইসলামের সূচনা লগ্ন থেকেই। করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম যে, ধর্মের প্রথম ওয়াহী শুরু হয়েছে اقرأ (পড়) শব্দ দিয়ে। 'উম্মী' নবীর উপর অবতীর্ণ প্রথম ওয়াহীতেই যে ধর্ম মানুষকে জ্ঞান ও কলমের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, মুহূর্তের জন্যও সে ধর্মের সম্পর্ক জ্ঞান ও কলমের সাথে কি ভাবে ছিন্ন হতে পারে। জ্ঞান ও ধর্মের মাঝে দূরত্ব ও অপরিচয় ইসলামের ক্ষেত্রে অকল্পনীয়। প্রথম দিন থেকেই 'ইল্‌ম হচ্ছে ইসলামের বিশ্বস্ত সহচর। বদর যুদ্ধের কুরায়শী বন্দীদের মধ্যে যাদের মুক্তিপণ দেওয়ার মতো সঙ্গতি ছিলনা তাদের বলা হলো—আনসার ও মুহাজিরদের দশ দশজন ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে দাও ; তোমরা মুক্তি পেয়ে যাবে। এতেই প্রমাণিত হয় 'ইল্‌মের সাথে ইসলামের সম্পর্ক কত গভীর।

ইসলাম যুগের সহযাত্রী নয়—পথপ্রদর্শক

এই যুগসন্ধিক্ষণে ইসলামী বিশ্বের 'আলিম সমাজের দায়িত্ব ছিল মুসলিম তরুণ ও যুব সমাজের মনে এ ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে না দেওয়া যে, শক্তি ও ক্ষমতার বলেই শুধু ইসলাম টিকে থাকতে পারে, সময়ের বিবর্তন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে চলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। ইসলাম হচ্ছে মানবতার শৈশব কালের ধর্ম, যখন যুগের চাহিদা ছিল সীমিত এবং জীবনের পরিধি ছিল সংকীর্ণ। সুতরাং বর্তমান সমস্যাসংকুল পৃথিবীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষের যুগে জীবন ও সভ্যতার এ বিস্তৃত অংগনে প্রবেশাধিকার লাভের যোগ্যতা তার নেই।

ইসলামী বিশ্বের 'আলিম সমাজের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল সময়ের গর্বিত চ্যালেঞ্জকে বলিষ্ঠ সাহসিকতার সাথে গ্রহণ করা, নিজেদের অতুলনীয় মেধা, প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্য দ্বারা সমস্যা ও ব্যাধির ক্ষেত্র ও কারণ নির্ণয় করা এবং সর্বযুগের সর্বজনীন জীবন-বিধান আল-কুরআন ও সুন্নাহ্‌র চিরন্তন বিধিমালার আলোকে জীবন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির নতুন ধারাকে ইসলামের

অনুগামী করার চেষ্টায় যত্নবান হওয়া। এ মহা দায়িত্ব পালনে অবহেলা ও বিচ্যুতির প্রাথমিক কুফল হলো ধর্মহীনতা, আর ভয়ংকরতম কুফল ও শেষ পরিণতি হলো ধর্মদ্রোহিতা। ইসলামী বিশ্বের যে-কোন দেশে আজ আপনি যাবেন, বেদনাহত চিত্তে উপরিউক্ত দু'টি অবস্থার যে কোন একটি আপনাকে অবশ্যই অবলোকন করতে হবে।

বর্তমান সময়ে আমাদের প্রধান কর্তব্য হলো তারুণ্য গর্বিত যুবসমাজের মনে এ বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা যে, ইসলাম তার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও স্বকীয়তা অক্ষুণ্ণ রেখেই যুগ, জীবন ও সভ্যতার সকল চাহিদা মিটাতে পারে, পারে নির্ভুল পথ-নির্দেশনা দিতে। ইসলামই পারে মানব সভ্যতাকে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের পরিণতি থেকে বাঁচাতে। আমাদের আরো প্রমাণ করতে হবে যে, ইসলাম নির্দেশিত পথ থেকে বিচ্যুত যে জীবন, যে সমাজ ও যে সভ্যতা, তা মানব জীবন নয়, মানব সমাজ নয়, নয় মানব সভ্যতা।

ইসলামকে সব স্বার্থের ঊর্ধ্বে তুলে ধরুন

ইসলামী বিশ্বের 'আলিম ও বুদ্ধিজীবী সমাজের দ্বিতীয় কর্তব্য হলো ইসলামকে দল-উপদল এবং সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের ঊর্ধ্বে তুলে ধরা। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমি আপনাদের বলছি, ইসলামের স্বার্থে প্রয়োজন হলে সমস্ত দল ও সংগঠন ভেঙে দেওয়ার এবং নাম, প্রতীক ও স্বাতন্ত্র্য মুছে ফেলে একাকার হয়ে যাওয়ার মত উদার ও সাহসী মানসিকতা আমাদের অবশ্যই অর্জন করতে হবে। দল ও সংগঠনের স্বার্থের চেয়ে দীন ও উম্মাহ্‌র স্বার্থই অধিক প্রিয় হতে হবে। সুনাম ও অবদানের স্বীকৃতি লাভের মোহ আমাদের বর্জন করতে হবে। রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের মু'জিযা ছিল এই যে, তাঁর পুণ্য সংস্পর্শে এসে সুনাম ও কীর্তি অর্জনের মোহ সাহাবাদের অন্তর থেকে একেবারেই দূর হয়ে গিয়েছিল।

বুখারী শরীফের বর্ণনায়—হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) কোন এক মজলিসে কথা প্রসঙ্গে বললেন : এক যুদ্ধে আমাদের পায়ে ফোস্কা পড়ে গিয়েছিল। আমরা তখন পায়ে ন্যাকড়ার পট্টি বেঁধে নিয়েছিলাম' যার ফলে সে যুদ্ধের নাম হয়েছিল 'যাতুর'-রিকা' (পট্টি বাঁধা পায়ের যুদ্ধ) একথা বলার পর হঠাৎ তাঁর মনে প্রশ্ন জাগল : এসব কথা আমি কেন বলছি ? এতে

আত্মপ্রচারণা হচ্ছে না তো? আমার আমল বাতিল হয়ে গেল না তো? কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক যদি এ কথা বলে বিদায় করে দেন যে, দুনিয়াতে তো নিজের কীর্তির কথা প্রচার করে বেড়িয়েছ এবং সাহসী যোদ্ধা নামে খ্যাতিও কুড়িয়েছ। ও-ই তো যথেষ্ট, আমার কাছে আবার কি পেতে এসেছ? বুখারী শরীফের বর্ণনায় তাঁর এ আশংকা ও আক্ষেপের কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। অনুশোচনার সুরে তিনি বলেছেন ঃ হায়! যদি আমি এ কথা আলোচনা না করতাম! এত সামান্যতেই আল্লাহ্র রসূলের সাহাবী আত্মপ্রচারণার আশংকায় অনুতপ্ত হচ্ছিলেন। আর আজ আমাদের সবার চেষ্টা ও সাধনা শুধু এই যে, আমার কিংবা আমার দলের প্রোপাগাণ্ডা হোক।

আপনাদের এ পাঞ্জাবেরই বাসিন্দা ছিলেন গাযী মাহমুদ। ধর্মপাল নামে এক ভদ্রলোক বেশ রসিয়ে কথা বলতে পারতেন। এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন ঃ মাঝে মাঝে দেখা পত্রিকায় সংবাদ ছাপানো হয়—অমুক বুযুর্গের দস্ত মুবারকে অমুক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে। আসলে এখানে অমুক ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি গৌণ, দস্ত মুবারকের প্রচারণাই হলো মুখ্য। আমি এমন অনেককেই দেখেছি, যারা কোন নামকরা লোকের জানাযা পড়ানোর জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে সামনে এগিয়ে যান, মনে বড় খায়েশ ঃ আগামীকাল পত্রিকায় যদি ছবিটা এসে যায়। এ ধরনের মানসিকতা খুবই জঘন্য ও ক্ষতিকর। দেখুন! রোগীর মুমূর্ষু অবস্থায় স্বজনদের মনে সুনাম-সুখ্যাতির চিন্তা থাকে না। সবার তখন আন্তরিক কামনা, যেভাবেই হোক রোগী সুস্থ হয়ে উঠুক। তদ্রূপ গোটা ইসলামী বিশ্ব আজ অন্তিম শয্যায় মুমূর্ষু। আপনাদের এ দেশও হাজারো রোগে জর্জরিত। এচিন্তা এখন মন থেকে মুছে ফেলুন যে, সুখ্যাতি কার হবে! আগামী দিনের ইতিহাস কোন দল বা সংগঠনের বন্দনা গাইবে! এ তথ্য আজো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি যে, তাতারীদের ইসলাম গ্রহণের পেছনে কার নিরব প্রচেষ্টা ছিল অধিক সক্রিয়। কেননা আল্লাহ্র সেই নিঃস্বার্থ বান্দারা এতই নির্মোহ ও প্রচার বিমুখ ছিলেন যে, ইতিহাসের সূক্ষ্ম দৃষ্টিও তাঁদের সন্ধান খুঁজে পায়নি।

পাকিস্তানে আজ ইসলামী আইন বাস্তবায়ন, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির রূপায়ণ এবং অপসংস্কৃতির কবল থেকে উদ্ধারের যে জিহাদ শুরু হয়েছে তাতে নিজেকে আপনি একজন সাধারণ সৈনিকরূপে উৎসর্গ করুন। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই শুধু কাজ করুন—তাঁর দরবারে

আপনার নাম লেখা হবে নূরের হরফে। দুনিয়াতে সুনাম হলেই কি, না হলেই-বা কি। পাকিস্তানে এখন যে সংগ্রাম ও সংঘাত চলছে তা বিশেষ কোন দল বা মতাদর্শের সংঘাত নয়। এ সংঘাত ইসলাম ও গায়র ইসলামের সংঘাত। মনে করুন, একটা মসজিদ তৈরী হচ্ছে, এতে যারাই অংশ নেবে তারাই আজ্র, (ছওয়াব,) পুরস্কার লাভ করবে। কে কতটুকু অংশ নিল, কার নাম আগে এবং কার নাম পরে তা ভেবে দেখার বিষয় নয়। প্রবৃত্তির এই তাকীদকে যতদূর সম্ভব প্রতিহত করুন। সবাই নিজ নিজ মত ও কর্মপন্থায় অবিচল, মত ও পথ বর্জন করার বা সওদা বাজি করার কথা আমি বলছি না, ইসলামী দাওয়াতের এবং ইসলামী জীবন গড়ে তোলার এক অভিন্ন ক্ষেত্র ও সম্মিলিত ফ্রন্ট তৈরী করুন। তবেই শুধু আল্লাহ্ পাক আপনাদেরকে এদেশে এক আদর্শ ইসলামী সমাজ দেখে যাওয়ার সৌভাগ্য দান করবেন।

আত্মত্যাগ ও কুরবানী

আমাদের তৃতীয় কর্তব্য হলো ঃ জাতির সামনে আত্মত্যাগ ও কুরবানীর অনন্য দৃষ্টান্ত তুলে ধরা। নিজের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে হলেও অন্যের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। পারস্পরিক কলহ-কোন্দল সযত্নে পরিহার করতে হবে। আমাদের জীবন যত সহজ ও অনাড়ম্বর হবে, ত্যাগ ও কুরবানীর মহত্বে যত মহীয়ান হবে—কর্মের ময়দানে, সংগ্রামের ক্ষেত্রে তার সুফলও হবে তত গভীর ও সুদূরপ্রসারী। যে কোন মহৎ উদ্যোগ ও পদক্ষেপের জন্যই অন্তঃকলহ হচ্ছে সবচেয়ে ক্ষতিকর বিষয়। ধর্মীয় আনুষঙ্গিক বিষয়ে মতপার্থক্য ও বাদানুবাদের ক্ষেত্র ভিন্ন হওয়া উচিত। হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (র) তাঁর 'মকতূবাতে' মন্তব্য করেছেন ঃ সম্রাট আকবরের ধর্ম বিমুখতার মূল কারণ এই যে, মোল্লাদেরকে তিনি মোরগ-লড়াইয়ের মত তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হতে দেখেছেন। খুটিনাটি মাস'আলা নিয়ে যখন তখন তারা তর্কে নেমে পড়ত এবং প্রয়োজনে পাক্কা দুনিয়াদারদের মতই নিজেদের মুখোশ খুলে ফেলত, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে নিজেকে বাদশাহ্র সামনে তুলে ধরার চেষ্টায় কোমর বেঁধে নেমে পড়ত। আকবর ভাবলেন ঃ এই যদি হয় ধর্মপণ্ডিতদের অবস্থা তবে আমি আমার সভাসদবর্গই-বা খারাপ কিসে। আমাদের মত পাক্কা দুনিয়াদাররাও তো স্বার্থসিদ্ধির জন্য এতটা নীচে নেমে আসতে পারে না, যতটা পারে এই আল-খেল্লাধারী ধার্মিকরা।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (র) যখন সংবাদ পেলেন যে, বাদশাহ জাহাঙ্গীর কিছু সংখ্যক 'আলিমকে পরামর্শের জন্য দরবারে স্থায়ীভাবে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তখন তিনি এই মর্মে নওয়াব সৈয়দ ফরীদকে চিঠি লিখলেন যে, সাবধান! বাদশাহ যেন অমন কর্ম না করেন। তাঁকে বরং যে কোন একজন খাঁটি দীনদার ও হক্কানী 'আলিম নিয়োগের পরামর্শ দাও। মুজাদ্দিদে আলফেছানী সাহেব তাঁর আল্লাহ্-প্রদত্ত ইসলামী দূরদর্শিতার আলোকেই এ পরামর্শ দিয়েছিলেন। এর অর্থ অবশ্যই এ নয় যে, সব কিছুতে, সব মজলিসে একজন মাত্র 'আলিমই শুধু থাকবেন। আমার বক্তব্য শুধু এই যে, 'আলিম সমাজের অন্তর্কলহ ও পারস্পরিক কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি এমনি ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনে দেশ ও জাতির জন্য।

বিপদের আশংকা দেখে সতর্ক করার অধিকার সকলের রয়েছে। বয়স বা পদমর্যাদার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। একটা ছোট্ট শিশু কিংবা একজন সাধারণ মজদুরও একথা বলতে পারে যে, ঘরের দরজা খোলা রয়েছে, চোর ঢুকতে পারে।

অনুরূপভাবে আমি অধমও আপনাদেরকে কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক করছি। প্রথমত, আধুনিক নব্য শিক্ষিতদের মনে যেন এ ধারণা জন্মলাভের সুযোগ না পায় যে, কুরআন-সুন্নাহ এবং সংশ্লিষ্ট ফিকাহ্‌শাস্ত্র বর্তমানের প্রগতিশীল সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। আধুনিক জীবন সমস্যার সমাধান তাতে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। এ ধারণা খুবই মারাত্মক, এমনকি তা মানুষকে ধর্মদ্রোহিতার পথেও নিয়ে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, কর্মে ও আচরণে সাধারণ জনতা ও ক্ষমতাসীন মহলের সামনে আপনাদেরকে একথা প্রমাণ করতে হবে যে, মানুষ হিসাবে আপনাদের স্থান ও মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। আপনাদের অনাড়ম্বর ও মোহমুক্ত জীবন, আপনাদের অল্পে তুষ্টি ও নিঃস্বার্থপরতা জাতির জন্য যেন হতে পারে অনুকরণীয় আদর্শ। গাড়ী, বাড়ী, পদ ও বেতনের লোভ এবং ক্ষমতা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার মোহ যেন আপনাদের বিচ্যুত করতে না পারে জীবনের মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পথ থেকে। আমি পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই যে, জীর্ণবস্ত্রধারী দরবেশদের পক্ষেই বেশি থেকে বেশি কাজ করা সম্ভব। কেননা, ক্ষমতার শীশমহলের অধিবাসী দুনিয়াদারদের মাথা তাদের সামনেই শুধু নত হয়। তবে পাইকারী হারে সবাইকে চাটাই-ঝুড়ীর বাসিন্দা হওয়ার পরামর্শ

আমি দিচ্ছি না। তবে বাস্তব সত্য এটাই যে, শীশমহলের লোকেরা এই তাদেরই কেবল সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানায়, যাদের মনে লোভ নেই, মোহ নেই, নেই কোন অভিযোগ ও প্রত্যাশা।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানীর সামনে সমকালীন সম্রাটদের মাথা নত হয়েছিল কেন! কারণ আল্লাহ্‌র এ প্রিয় বান্দা পায়ের ধুলো দেওয়ার জন্যও সম্রাটের দরবারমুখো হন নি, সম্রাটের কাছে সুপারিশ পাঠান নি। মুসল্লায় বসে আল্লাহ্‌র সাথে মিতালী করেছেন, প্রয়োজনে পরামর্শ দিয়েছেন, উৎসাহ জুগিয়েছেন, আবার তিরস্কারও করেছেন। আমাদের মহান পূর্বসূরীদের সকলেই এভাবেই জীবন কাটিয়েছেন। ক্ষমতাসীনদের কাছে না ঘেঁষে দূর থেকেই তাঁরা পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁরা কি করেছেন? প্রশাসনের জন্য সৎ ও যোগ্য লোক সরবরাহ করেছেন। তাঁদের সারা জীবনের নীতি ছিল, দূর থেকে আগুনের তাপ নাও, ক্ষতি নেই; কিন্তু হাত দিতে যেও না, পুড়ে যাবে। বিভিন্ন পরিবেশে, বিভিন্ন সমাবেশে, বিভিন্ন ভাবে যেসব কথা আমি আরয করেছি তার সারনির্যাস এই যে, আমরা আজ এক অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন। আমাদের সামনে গোটা ইসলামী বিশ্বের ভাগ্য নির্ধারণের মুহূর্ত উপস্থিত। জাতি হিসেবে আমাদেরকে আজ যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে। আমাদের অযোগ্যতা যেন ইসলামের দুর্নাম এবং মুসলিম উম্মাহ্‌র ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। এমন কথা বলার কিংবা লেখার সুযোগ যেন না আসে যে, 'আলিম সমাজকে দিয়ে কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নেই। অত্যন্ত বিনয় ও সংকোচের সাথে আমি আপনাদের খিদমতে একথাগুলো আরয করলাম।

আল্লাহ্ আমাকে এবং আপনাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন॥

আল্লাহর এ দুনিয়া বাণিজ্য মেলা নয়

(পাকিস্তান সরকারের ওয়াক্‌ফ্ বিভাগের উদ্যোগে বিভাগীয় সদর দফতর লাহোরে আয়োজিত 'আলিম ও সুধী সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণ)।

বিষয়বস্তু ঃ সমকালীন বিশ্বে ইসলামের প্রয়োজনীয়তা

তারিখ ঃ ২৭শে জুলাই, ১৯৭৮

হামদ ও সালাতের পর !

এ বিশ্ব এক পবিত্র ওয়াক্‌ফ

সম্মানিত 'আলিম সমাজ, ওয়াক্‌ফ্ বিভাগের কর্মীবৃন্দ এবং অন্যান্য শ্রোতা বন্ধুগণ !

পাকিস্তান সরকারের ওয়াক্‌ফ্ বিভাগ আমাকে এখানে আমন্ত্রণ করে আমার যে মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন সে জন্য আমি তাদের আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই। আমন্ত্রণ পেয়ে আমি ভেবেছিলাম ওয়াক্‌ফ্ বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সাথে পরিচয়, সদর দফতর পরিদর্শন এবং এর কর্মসূচী ও কর্মতৎপরতা সম্পর্কে অবগতি লাভই বুঝি অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। কিন্তু এখানে এসে জানতে পেলাম, আজকের এ মহতী অনুষ্ঠানে আমাকে "সমকালীন বিশ্বে ইসলামের প্রয়োজনীয়তা" শীর্ষক আলোচনায় যোগ দিতে হবে। প্রথমটায় আমি ভেবেই পেলাম না, এমন একটি দর্শনধর্মী বিষয়বস্তুর সাথে এ প্রতিষ্ঠানের কি সম্পর্ক। কিন্তু পর মুহূর্তেই আমার অন্তরে এ চিন্তা উদ্ভাসিত হলো যে, আমাদের এ বিরাট পৃথিবীতো আসলে একটি ওয়াক্‌ফ্ প্রতিষ্ঠান এবং এ ওয়াক্‌ফ্ স্টেটের মুতাওয়াল্লী তথা পরিচালক হওয়ার যোগ্যতা তাদেরই রয়েছে যারা এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং ওয়াক্‌ফ্ দাতার ইচ্ছা ও পরিকল্পনার প্রতি আন্তরিক আগ্রহী ও পূর্ণ বিশ্বাসী।

আজ অবস্থা এই যে, পৃথিবী হচ্ছে চরম অব্যবস্থা ও খামখেয়ালীর শিকার এক মজলুম ওয়াক্‌ফ্ সম্পত্তি। এই ওয়াক্‌ফের মুতাওয়াল্লী ও পরিচালকগণ এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে মোটেই অবগত নয়। সতর্কতার খাতিরেই শুধু এভাবে বলা। নইলে সত্য কথা এই যে, এ ওয়াক্‌ফ্ প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবৃন্দ আজ ওয়াক্‌ফের বিঘোষিত নীতি ও লক্ষ্যের প্রতিই বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। আজ পর্যন্ত তারা এটাও স্থির করতে পারেনি যে, মানুষের আবাসভূমি এই বিশ্ব সংসারের স্থপতি কে? এ পবিত্র ওয়াক্‌ফ্ সম্পত্তির দাতা কে? অভিজ্ঞতার আলোকে আপনারা ভালোভাবেই জানেন যে, সর্বপ্রথম ওয়াক্‌ফ্‌দাতা সম্পর্কে অবগতি লাভ করা জরুরী। অতঃপর জানতে হয় ওয়াক্‌ফ্‌দাতার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সব শেষে প্রয়োজন এ অনুভূতি জাগ্রত হওয়া যে, আমরা এ পবিত্র সম্পত্তির আমানতদার মাত্র, এর মালিক মোখতার নই। এই 'অভিভাবকত্বে নিয়োগ বোঝানোর জন্য কুরআনুল করীমে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ـ

"যে জিনিসের উপর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিনিধি বানিয়েছেন তা থেকে তোমরা (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় করো।" প্রতিনিধিত্ব মূলত অভিভাবকত্বেরই আরেক রূপ। কেননা বিশ্ব জগতের স্রষ্টা পৃথিবীকে সৃষ্টি করে মানব জাতিকে তাতে আবাদ করেছেন এবং ইরশাদ করেছেন ঃ

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ـ

"তিনিই তোমাদের ব্যবহারের জন্য পৃথিবীর যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করেছেন"। অর্থাৎ নীতিগতভাবে তোমরা এর মালিক নও ; বরং আমার প্রতিনিধি রূপে আমার আইন ও সন্তুষ্টি মুতাবিক এর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার যিম্মাদার মাত্র।

আমরা জানি, ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র ওয়াক্‌ফ্ প্রতিষ্ঠানের জন্যও কিছু নিয়ম ও বিধি-বিধান থাকে এবং সে নিয়ম ও বিধান মুতাবিকই তা পরিচালিত হয়। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছি সেটাও ঐ ধরনের অনেকগুলো

ওয়াক্ফ্ সম্পত্তি পরিচালনার একটি কেন্দ্রীয় কার্যালয়। এর দায়িত্ব হলো ওয়াক্ফ্ সম্পত্তিসমূহের হিফাজত ও সংরক্ষণ এবং ওয়াক্ফ্দাতাদের ইচ্ছার প্রতিফলন ও উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন। আমি আশা করব যে, অর্পিত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আপনারা বরাবর যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার স্বাক্ষর রেখে আসছেন। কিন্তু এ দুর্ভাগা পৃথিবীর কথা ভেবে দেখুন; এ এমন এক পবিত্র ওয়াক্ফ্ সম্পত্তি, যার তুলনা ওয়াক্ফের ইতিহাসে নেই, (কেননা ওয়াক্ফ্ পদ্ধতির শুরু তো পৃথিবী জন্মের অনেক পরে) এই ভূমণ্ডলীয় গ্রহকে ওয়াক্ফ্ সম্পত্তিরূপে অনেক পূর্বেই আল্লাহ্ পাক সৃষ্টি করেছেন এবং যুগে যুগে বিভিন্ন নবীকে আর তাঁদের জাতিকে এর মুতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপক নিয়োগ করেছেন। কাজেই এটাও একটা ওয়াক্ফ্ প্রতিষ্ঠান। শেষ যুগে শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর উম্মতকে এ ওয়াক্ফ্ প্রতিষ্ঠানের শেষ মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করা হয়েছে।

এ উম্মাহ আপনি গজিয়ে উঠা জংলী ঘাস নয়

পূর্ববর্তী নবীগণের নবুওয়তী দায়িত্ব তাঁদের ব্যক্তিসত্তায় সীমাবদ্ধ ছিল। এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বৈশিষ্ট্য এই যে, নবুওয়তের সাথে সাথে এক দায়িত্বশীল উম্মতও তাঁকে দান করা হয়েছে। সুতরাং এ উম্মাহ হঠাৎ গজিয়ে উঠা কোন আগাছা নয়। এ উম্মাহ হলো এক মহান আদর্শ ও জীবন দর্শনের বাহক ও প্রচারক। কুরআনুল করীমের বিভিন্নস্থানে অত্যন্ত গুরু দায়িত্ব নির্দেশক শব্দাবলী ব্যবহার করা হয়েছে এ উম্মাহ্র সম্মানে। যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ -

(তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি, বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য তোমরা উত্থিত। اخرجت (উত্থিত করা হয়েছে) শব্দের প্রয়োগ একথাই প্রমাণ করে যে, এ উম্মত সৃষ্টির পিছনে রয়েছে এক মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, এক বিরাট কল্যাণ ও হিকমত, তা হলো মানবতার সংরক্ষণ এবং জগত সংসারের মহান স্রষ্টার ইচ্ছা ও নির্দেশ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে খলীফাতুল্লাহ্'র গুরু দায়িত্ব পালন। এ মর্মে হাদীছ শরীফে আরো সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ -

(জটিলতা সৃষ্টির জন্য নয় বরং সহজ সাবলীলতা প্রদানের জন্যই তোমাদের পাঠানো হয়েছে) শব্দ প্রয়োগে একথা বোঝানো হয়েছে যে, তোমাদের নিয়োগ করা হয়েছে, তোমাদের নামে দায়িত্ব বন্টন করা হয়েছে এবং এক বিশেষ কর্তব্য অর্পণ করে তোমাদের পদমর্যাদা নির্ণীত করে দেওয়া হয়েছে। তোমাদের বৈশিষ্ট্য হলো, জটিল পদ্ধতি পরিহার করে সহজ সাবলীল ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। কোথাও কোন ক্ষুদ্র ওয়াক্ফ্ সম্পত্তি বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হলে (হোক সেটা মসজিদ, এতিমখানা কিংবা অন্য কোন বিষয় সম্পত্তি) সরকার তা রক্ষার জন্য উদ্যোগী হয়ে তড়িৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদানের ব্যবস্থা করেন, প্রয়োজন হলে সরকার এ কাজে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না। প্রতিদিন এ ধরনের কত ঘটনাই তো আপনাদের চোখের সামনে ঘটে থাকে।

আল্লাহ্র এ দুনিয়া বাণিজ্য মেলা নয়

সে ওয়াক্ফ্র কি করুণ দশা হতে পারে, যার অভিভাবক ও পরিচালক-মণ্ডলী ক্ষমতার অপব্যবহার করে চলেছে। খোদ ওয়াক্ফ্ সম্পত্তির মালিক-মোখতার বনে বসেছে। তদুপরি তার আচরণ মালিকসুলভ নয়, শত্রুসুলভ। সত্য কথা বলতে কি, মানুষ যেন আজ এ ওয়াক্ফ্ সম্পত্তির সাথে শ্মশান-সুলভ আচরণ শুরু করেছে। কোন শ্মশানেরও সম্ভবত এমন করুণ দশা ঘটা সম্ভব নয় যা মানুষের হাতে এই দুর্ভাগা পৃথিবীর ঘটেছে। ইকবালের ভাষায় ঃ جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا ہے قمار خانہ

ফিরিংগী জুয়াড়ীরা একে জুয়ার আখড়া বানিয়ে ছেড়েছে।

আপনাদের এই শহরের অমর কবি ইউরোপকে লক্ষ্য করে গর্জে উঠেছিলেন ঃ

خدا کی بستی دکاں نہیں

আল্লাহ্র এ দুনিয়া, বাণিজ্য মেলা নয়।

মসজিদকে মদ-জুয়ার আখড়া বানানো কোন মুসলমানের পক্ষেই বরদাশ্ত করা সম্ভব নয়। কিন্তু হাদীছের ভাষায় যে পৃথিবীর সবুজ গালিচা ঢাকা ভূমি সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ

جعلت لى الارض مسجدا و طهورا -

(গোটা পৃথিবীকে আমার জন্য মসজিদে পরিণত করা হয়েছে) বিশ্ব নবীর সেই প্রিয় মসজিদকে আমাদেরই চোখের সামনে ফিরিংগী জুয়াড়ীরা নরক গুলযার করে রেখেছে।

আমার মনে হচ্ছে আলোচ্য বিষয় নির্ধারণকারিগণ যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। এই ক্ষুদ্র ওয়াক্‌ফের সূত্র ধরে এক বিশ্ব ওয়াক্‌ফের প্রতি তারা আমাদের সবার মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। সুতরাং আমি মনে করি, আপনাদের এ বিষয়বস্তু নির্ধারণ মোটেই অপ্রাসংগিক নয়। এই মুমূর্ষু পৃথিবীর করুণ অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। কি নির্মম আচরণ চলছে খোদার সাজানো এই জগত সংসারের সাথে! সৃষ্টি ও নির্মাণ ছিল যাদের পবিত্র দায়িত্ব, তারাই আজ মেতে উঠেছে ধ্বংসের মহা উল্লাসে। যাদের উচিত ছিল এটাকে খোদার দেওয়া আম)নত মনে করা, তারাই এটাকে মনে করে বসে আছে পৈত্রিক সম্পত্তি। যাদের দায়িত্ব ছিল পৃথিবীর বাসিন্দা-দের আবেগ ও অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন, আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জগতের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি সাধন এবং মানুষে মানুষে সাম্য ও সম্প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন, তারাই মানুষের আবেগ-অনুভূতির ধ্বংসস্তূপের উপর মানুষের কংকাল দিয়ে মানুষের কবরের উপর গড়ে তুলছে তাদের আরাম-আয়েশ ও বিলাস-ব্যসন ও ঐশ্বর্যের সৌধমালা। পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা কি? পৃথিবীতে কোন ওয়াক্‌ফ্ সম্পত্তির এমন দূরবস্থা কখনো হয়নি, যে দূরবস্থা এ বিশাল ও বৃহত্তম ওয়াক্‌ফ্ সম্পত্তির ঘটছে ঐ সব অমানুষদের হাতে যারা এর স্বঘোষিত অভিভাবক সেজে বসে আছে। কেঁউ তাদের নিয়োগ করেনি। ওরা ছিনতাই-কারী, লুণ্ঠনকারী। গোটা পৃথিবীকে ওরা পরিণত করেছে মহাশ্মশানে। চিতায় জ্বলছে কত লাশ, কত জাতির মৃত শব, আরো জ্বলছে মানবতার গলিত শব। ইকবালের ভাষায়---আজ ষড়যন্ত্র চলছে মানবতার বিরুদ্ধে, নৈতিকতার বিরুদ্ধে, ষড়যন্ত্র চলছে কল্যাণ ও সুকৃতির বিরুদ্ধে। এ ষড়যন্ত্র মানব সভ্যতার ভবিষ্যত ধ্বংসের; বরং এ ষড়যন্ত্র মানবতার বর্তমান ধ্বংসের। এ পবিত্র ওয়াক্‌ফ্ সম্পত্তি এমন নির্দয়ভাবে বিনষ্ট হচ্ছে যে, গোটা মানব জাতির আজ বুক ফাটা কান্নায় ভেঙে পড়া উচিত, প্রতিবাদের হুংকারে ফেটে পড়া উচিত।

ইসলামের আদালতে বিচার দায়ের করুন

এ মহান ওয়াক্‌ফের প্রতি যে নির্মম আচরণ করা হচ্ছে, এ মহান ওয়াক্‌ফ্ ধ্বংসের যে আত্মঘাতী আয়োজন চলছে, তাতে গোটা মানব জাতির উচিত প্রতিরোধ গড়ে তোলা। প্রতিটি আদম সন্তানের উচিত বাদী হয়ে মোকদ্দমা দায়ের করা। কিন্তু কোন আদালতে পেশ করা যায় এ মোকদ্দমা? জাতিসংঘের আদালতে কি আশা করা যায় এ মামলার সুষ্ঠু বিচার পাওয়ার? আপনাদের ব্যক্তিগত মামলাগুলো নিম্ন আদালত থেকে শুরু করে জজকোর্ট হাইকোর্ট পেরিয়ে সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। প্রধান বিচারপতি পর্যন্ত আপনারা যেতে পারেন। কিন্তু গোটা মানব পরিবারের বিরুদ্ধে এ বিশ্ব-জোড়া ষড়যন্ত্রের ফরিয়াদ নিয়ে কোন আদালতে আপনি দাঁড়াবেন? ধ্বংসের হাত থেকে এ মহান ওয়াক্‌ফ্‌কে রক্ষার জন্য কি উপায় আপনি অবলম্বন করবেন? আইনবিদদের বুদ্ধি নিন, মানবতার কল্যাণকামীদের পরামর্শ নিন, পৃথিবীর কোন আদালতে দাখিল করা যেতে পারে এ মোকদ্দমা। মুশকিল হলো আমাদের মামলার আসামী আজ বসে আছে বিচারকের আসনে। যে মামলার আসামী নিজেই বিচারক, সে মামলার কি পরিণতি হতে পারে? দুর্ভাগ্য এই যে, খোদ যে বিচারকের বিরুদ্ধেই আজ আমাদের মামলা তা দাখিল করা হচ্ছে তারই বিচারালয়ে। সুতরাং এ মামলার কি পরিণতি হবে তা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে?

সর্বাগ্রে তাই আজ এমন আদালত প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন যেখানে মানবতার এ মামলা রুজু করা সম্ভব। সে আদালত বর্তমান পৃথিবীতে নেই, নেই সেই শক্তি যা আদালতের রায় গ্রহণে আসামীকে বাধ্য করতে পারে। মানবতার এ মামলার ফয়সালা যে আদালত করবে সে আদালতের দুটি অপরিহার্য গুণ থাকতে হবে: ইনসাফ আর শক্তি। কোন জ্ঞানীজন, কোন গুণীজন কিংবা কোন মানবদরদীর আদালতে মামলা দায়ের করলে তিনি অবশ্যই ইনসাফ-পূর্ণ ফয়সালা করবেন। তাঁর রায় হবে পক্ষপাতশূন্য, অপরাধ হবে চিহ্নিত এবং অপরাধী হবে দণ্ডিত। কিন্তু মানবতার জন্য তা কোন কল্যাণপ্রসূ কাজ হবেনা। কেননা অপরাধীর ঘাড়ে দণ্ড চাপিয়ে দেওয়ার কোন ক্ষমতা উক্ত আদালতের নেই, মানবতার ফরিয়াদে সাড়া দিতে পারে এমন শক্তি ও ক্ষমতা আজ কোন মুসলিম দেশের নেই। এমন কি নিজ দেশের ভূখণ্ডকে শত্রুর জুলুম ও আগ্রাসন থেকে রক্ষার ন্যূনতম শক্তিটুকুও নেই তাদের, আরো

স্পষ্ট করে বলতে গেলে তারা নিজরাই আজ খুনী, আসামীদের, মানবতার আদালতে দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীদের বিশ্বস্ত সেবক। মানব বিশ্বের মর্মান্তিক ঘটনা এই যে, যে মহান ওয়াক্ফ্ সম্পত্তি মানব সম্প্রদায়ের হাতে আমানতরূপে অর্পিত হয়েছিল তাতে চলছে চরম বিশ্বাসঘাতকতা ও খেয়ানত। পৃথিবীর ইতিহাসে এ বিশ্বাসঘাতকতার দ্বিতীয় কোন নজীর নেই। পৃথিবীর সব কিছুই যেন মায়ের দুধ। 'জোর যার মুল্লুক তার' এই বন্য আইন এখন পৃথিবীর সর্বত্র প্রচলিত।

স্বয়ং আল্লাহ্ পাক অতীব গুরুত্বের সাথে এ মহান ওয়াক্ফ্ সম্পত্তি সৃষ্টি করেছেন। কুরআনুল করীমসহ সকল আসমানী গ্রন্থে বারবার সেকথা আলোচনা করেছেন। একবার বলাই যেখানে যথেষ্ট ছিল সেখানে বারবার আলোচনা করেছেন এবং বিশদভাবে সব কিছুর বর্ণনা দিয়েছেন ঃ পৃথিবীকে আমি এভাবে বিস্তৃত করেছি, সবুজ কার্পেট মোড়া জমিনের উপর টানিয়েছি (নীল) আকাশের চাঁদোয়া, সূর্যকে বানিয়েছি তার ঝুলন্ত প্রদীপ, চাঁদকে বানিয়েছি স্নিগ্ধ আলোর আধার, ক্ষেতে বাগানে উৎপন্ন করেছি ফল ও ফসল, ছড়িয়ে দিয়েছি নদ-নদী, সৃষ্টি করেছি সাগর-মহাসাগর। এই বিশদ বর্ণনার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো মানুষের অন্তরে এই মহান ওয়াক্ফের গুরুত্ব জাগরুক করা। আপনার হাতে একখানি কাগজ দিয়ে যদি বলা হয়, এটা এক বড় ধরনের ওয়াক্ফ্ সম্পত্তির সনদ, এক মহান উদ্দেশ্য ও কল্যাণের জন্য এ সম্পত্তি ওয়াক্ফ্ করা হচ্ছে, এ ওয়াক্ফের আয়তন বিরাট. এতে রয়েছে বড় বড় ইমারত. ইত্যাদি, তখন নিশ্চয় আপনার মনে ও চিন্তায় উক্ত ওয়াক্ফের গুরুত্ব সম্পর্কে উপলব্ধি জাগ্রত হবে। পৃথিবীর সৃষ্টি প্রসংগে বিশ্ব-মানবের কাছে আল্লাহ্ পাক যে বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন তার উদ্দেশ্যও এই। কিন্তু মানব সমাজ কি এই মহান ওয়াক্ফ্ সম্পত্তির গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছে? পৃথিবীর বাস্তব চিত্র কি? কোথাও সরাসরি ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চলছে আর কোথাও অবস্থা এই যে, উপকরণ ও সুযোগ-সুবিধা রয়েছে প্রচুর, শক্তি ও সম্ভাবনা হচ্ছে অফুরন্ত, কিন্তু এসব কিছু যাদের কুক্ষিগত তাদের জীবনে নেই কোন আদর্শ, নেই কোন গঠনমূলক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। মানবরূপী এই পশুদের দিয়ে কি করে সম্ভব মানবতার কোন কল্যাণ সাধন! তাদের হৃদয়ে যে নেই মানবতার প্রতি বিন্দুমাত্র দরদ, নেই প্রেম-প্রীতি, সাম্য ও সুনীতি এবং মানব সভ্যতার প্রতি সামান্যতম মমত্ববোধ।

য়াহূদী ও খৃস্ট ধর্মে কোন পথ-নির্দেশনা নেই

উপরিউক্ত উদ্দেশ্যাবলীর সফল বাস্তবায়ন নবী-রসূলদের দ্বারাই শুধু সম্ভব ছিল। কিন্তু অবস্থা আজ এই যে, ইসলাম ছাড়া আর সব ধর্ম গোড়াতেই নবীর আদর্শ থেকে দূরে সরে গেছে। ফলে তাদের সম্পদভাণ্ডার আজ শূন্য। মানবতার কল্যাণে অবদান রাখার কোন যোগ্যতাই তাদের নেই। খৃস্ট ধর্মতো এখন এতটাই অন্তসারশূন্য যে, স্বীয় অনুসারীদের পথ-প্রদর্শন, আধুনিক জীবনের জটিল সব সমস্যার গ্রন্থি উম্মোচন কিংবা তাদের বিচ্যুতি ও অনাচারের প্রতিরোধ করার যোগ্যতাও তার নেই। কেননা ইতিহাসের নির্মম ঘোষণা এই যে, আজকের খৃস্ট ধর্ম হযরত ঈসা (আ)-এর সেই আসমানী ধর্ম নয়। প্রচলিত খৃস্ট ধর্ম হচ্ছে সেন্টপলের আবিষ্কার, মূল খৃস্ট ধর্মের বিকৃত রূপ। য়াহূদীবাদের বিকৃতিতো বহু আগের ইতিহাস। আজকের য়াহূদী ধর্ম কয়েকটি নামসর্বস্ব প্রথা-অনুষ্ঠানের নাম মাত্র, হযরত ইয়াকুব (অ)-এর সন্তান ও পরিবারকেন্দ্রিক তাদের ধর্ম। সুতরাং গোত্রপ্রীতি হলো তাদের মূলধর্ম। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় ও মানবগোষ্ঠীর কল্যাণ-অকল্যাণ নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই; বরং নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টির মাধ্যমে মানব সভ্যতার ধ্বংস সাধন হচ্ছে তাদের জাতীয় কর্মসূচী। তারা তো স্পষ্ট ভাষায়ই বলে থাকে যে, সারা বিশ্বে আমরা অশ্লীলতা ও নগ্নতা ছড়িয়ে দেব, সকল জাতির নৈতিক মূল্যবোধ ধ্বংস করে দেব, ঐতিহ্য ও সামাজিক ভিত ধ্বসিয়ে দেব; মেধা, মননশীলতা ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে তাদেরকে দেউলিয়া করে ছাড়ব। এভাবে বিশ্বের সকল জাতি দাবার ঘুটির মত আমাদের হাতে ব্যবহৃত হবে, আমরা ওদের শোষণ করব, ওরা আমাদের পদচুম্বন করবে। এই হচ্ছে য়াহূদী ধর্মের বাস্তব চিত্র ও চরিত্র।

আজকের পৃথিবীতে ইসলামই একমাত্র ধর্ম যার পক্ষে সমস্যা-সংকুল জীবন কাফেলার পথ প্রদর্শন করা সম্ভব, মানব সভ্যতার কল্যাণ ও সমৃদ্ধি অর্জনে অবদান রাখা সম্ভব। পৃথিবীতে ইসলামের এজন্য প্রয়োজন যে, বিশ্বের সকল জাতির চরিত্রে আজ ধ্বস নেমেছে, নৈতিক মূল্যবোধে ঘুণ ধরেছে এবং গোটা মানব সভ্যতা ধ্বংসের মহা আয়োজন চলছে। এমুহূর্তে বিশ্ব-ধর্ম ইসলামই পারে বিপর্যস্ত মানবতার হাত ধরে শান্তি ও মুক্তির চির সবুজ উদ্যানে নিয়ে যেতে।

হায়, যদি ওরা পৃথিবীটাকে একটা আশ্রম বা এতিমখানাই মনে করত। বিশ্বের জাতিবর্গের সাথে যদি ওরা এতিমসুলভ আচরণই করত তাতে আমাদের কোন আপত্তি হতোনা। ইউরোপ যদি গোটা পৃথিবীকে এতিম মনে করে আমাদের প্রতি ন্যুনতম মানবিক আচরণও প্রদর্শন করত তাতেই আমরা কৃতার্থ হতাম, মানবতার জন্য সেটাও হতো অনেক ভালো, অনেক সৌভাগ্য।

পৃথিবী আজ শিকার ভূমি

কিন্তু না, অতটুকু করুণাও মানবতার ভাগ্যে জোটেনি। মানবতার আবাস ভূমি আজ পরিণত হয়েছে ইউরোপের শিকার ভূমিতে। ধারালো অস্ত্র হাতে, মারণাস্ত্রের বহর নিয়ে পৃথিবীর সর্বত্র আজ শিকারী দলের সদম্ভ বিচরণ। কোন একটি জাতি, কোন একটি জনগোষ্ঠী আজ রেহাই পাচ্ছেনা ওদের শিকার খেলা থেকে, মরণ ছোবল থেকে। বৃহৎ শক্তিবর্গের চোখে গোটা প্রাচ্য ও মুসলিম বিশ্ব আজ তাদের প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল সরবরাহের এক সমৃদ্ধ ক্ষেত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। এখান থেকে তারা পেট্রোল শোষণ করে, খনিজ দ্রব্য লুণ্ঠন করে, যুদ্ধের মাঠে শত্রুর মুকাবিলায় নরবলিরূপে এদের ব্যবহার করে, রান্না ঘরের জ্বালানী কাঠের চেয়ে অধিক মূল্য তাদের কাছে আমরা পেতে পারিনা। বিশ্বাস করুন---প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সব পানশালা আমি ঘুরে ঘুরে দেখেছি।

ইদানিং ওরা আমাদেরকে উন্নয়নশীল খেতাব দিতে শুরু করেছে। এতদিন তো---"অনুন্নত, পশ্চাদপদ" গালিই দিয়ে এসেছে। অনুন্নত জাতিবর্গের মূল্য তাদের বিচারে এইটুকু যে, প্রয়োজনে তা উত্তম জ্বালানীর কাজ দেয়। বাবুর্চি-খানায় আগুন জ্বালার প্রয়োজন হলে এরা প্রয়োজনীয় জ্বালানী সরবরাহ করে। তারা মনে করে, সকল জাতির ভাগ্য আজ আমাদের হাতের মুঠোয়, তাই মানুষের সাথে তাদের আচরণ হয়ে পড়েছে হিংস্র পশুসুলভ। এ হিংস্র বর্বরতা প্রতিহত করার এবং এ নারকীয় ধ্বংস-যজ্ঞ ঠেকানোর শক্তি পৃথিবীর কোন জাতির, কোন ধর্মের নেই। সবাই খুইয়ে বসেছে তাদের শক্তি ও যোগ্যতা। ভুলে গেছে জীবনের বাণী, বিস্মৃত হয়েছে অতীত ঐতিহ্য, সবাই আজ হতোদ্যম হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়েছে।

শেষ ভরসা ইসলাম

উত্তাল তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সাগর বক্ষে মানব কাফেলার এ ডুবন্ত কিশ্‌তীর ভবিষ্যত এখন নির্ভর করছে ইসলামের উপর, মুসলিম উম্মাহ্‌র কর্মকাণ্ডের

উপর। আপনাদের উপর আজ বিরাট দায়িত্ব বর্তেছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। নিজেদের দেশের কথা ভাবুন, সমাজ সংস্কারের কাজে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে আসুন। সবদেশের ইসলামী সমাজই আজ ব্যাধিগ্রস্ত, মুমূর্ষ। সুতরাং এই মুহূর্তে প্রতিকার ব্যবস্থা একান্ত জরুরী। সমাজ চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে---এটা বড় রোগ নয়; বরং সমাজের স্বভাব ও প্রকৃতিতে পচন ধরেছে---এটাই হচ্ছে ভয়ংকর ব্যাধি। একটি সমাজের চারিত্রিক অধপতন ততটা ভয়ের কারণ নয়। কেননা তার জন্য রয়েছে অসংখ্য ব্যবস্থা, হাজারো প্রতিষেধক। কিন্তু সমাজের স্বভাব ও প্রকৃতিতেই যখন পচন ধরে, কোন ঔষধই তখন আর ক্রিয়া করেনা, কোন ব্যবস্থাই ফলদায়ক প্রমাণিত হয়না। সমাজ দেহের নাড়ীর খবর নেওয়া তখন জরুরী হয়ে পড়ে।

ওয়াক্‌ফ্‌ বিভাগের হাতে রয়েছে সমাজ সংস্কারের অফুরন্ত সম্ভাবনাময় এক সুযোগ, এক মোক্ষম হাতিয়ার। আমি মসজিদের ইমাম ও খতীব সাহেব-দের কথাই বলছি। সমাজের বুকে তাদের অখণ্ড প্রভাব। জনতার সাথে তাদের সংযোগ সরাসরি। সর্বোপরি তাঁরা ধর্মীয় মর্যাদা ও শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন। ওয়াক্‌ফ্‌ বিভাগ যদি এ দায়িত্ব পালনে অগ্রণী হয়, ইমাম ও খতীবগণ যদি সমাজ জীবনে তাঁদের মর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হন, দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনায় উদ্বুদ্ধ হন এবং বিরোধ ও মতপার্থক্যপূর্ণ বিষয়গুলো সযত্নে পরিহার করে সমাজ সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডে নিজেদের মনোসংযোগ কেন্দ্রীভূত করেন, তাহলে দেশ ও জাতির ভাগ্য যেমন পরিবর্তন হবে, তেমনি তা গোটা ইসলামী বিশ্বের জন্যও হবে বিরাট খেদমত।

ইস্তাম্বুল বিজয়ের ইতিহাস আপনারা জানেন---কনস্টান্টিনোপল যখন মুহম্মদ ফাতেহ (বিজয়ী মুহাম্মদ)-এর হামলার ভয়ে কম্পমান, বিজয়ী বাহিনী যখন নগরপ্রাচীর গুড়িয়ে শহরে প্রবেশ করছিল তখন ধর্ম-পণ্ডিত-দের বিবদমান দুই দলে তুমুল তর্ক চলছিল নৈশ ভোজে হযরত 'ঈসা ('আলায়হি'স-সালাম) যে রুটি গ্রহণ করেছিলেন তা কিসের তৈরী ছিল! এক পক্ষ অপর পক্ষকে লক্ষ্য করে ছুড়ছিল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সব যুক্তির তীর। তাদের অবস্থা এতটাই বেহাল হয়ে পড়েছিল যে, মুহাম্মদ ফাতেহকে তর্ক সভায় হাযির হয়ে সে মোরগ লড়াই থামাতে হয়েছিল। আমার আশংকা, এদেশেও না আবার তেমন কোন মতবিরোধপূর্ণ বিষয় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। আর সেই সুযোগে সংস্কৃতি নামের আগ্রাসী বাহিনী আমাদের উপর

চূড়ান্ত আঘাত হেনে বসে। মুসলিম সমাজের বর্তমান অবস্থা এই যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিজয়ী বেশে মুসলিম সমাজের গভীরে পেঁ ৗছে গেছে। ইসলামী মূল্যবোধগুলো ধ্বসে পড়ছে। দেশ ও সমাজ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। ইসলামী কৃষ্টি ও সংস্কৃতি মুমূর্ষ অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে। চিন্তার জগতে মুসলিম উম্মাহ ব্যাপক ধর্মদ্রোহিতার শিকার হচ্ছে। অথচ আমরা নিশ্চিত আয়েশে 'ইলমে গায়বের আলোচনায় মশগুল। এই মুহূর্তেই যেন আমাদের ফয়সালা করতে হবে রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম মানব ছিলেন, না অতি মানব! একথা আমি আশা করতে পারিনি যে, এমন নাযুক ও সংকটময় পরিস্থিতিতে---যখন মহা বিপদসংকেত আমাদের মাথার উপর ঝুলছে---কেউ এধরনের অর্থহীন আত্মঘাতী আলোচনায় লিপ্ত হবে। কিন্তু এ দুনিয়ায় সবকিছুই সম্ভব। এমন হওয়া বিচিত্র নয় যে, আমরা আমাদের মেধা ও প্রতিভা এবং শক্তি ও সম্ভাবনা বিনষ্ট করতে থাকব বিরোধপূর্ণ বিষয়ে, খুঁটিনাটি ঝগড়ায়, আর শত্রুর তলোয়ার সেই সুযোগ পেঁৗছে যাবে শাহ্-রগের কাছে। জানিনা, আমার এ আবেদন মর্মমূলে কতটা রেখাপাত করবে। আমি আবারো বলছি---আপনারা সংকট উপলব্ধি করুন, আপনাদের এদেশ এখন এক সংযোগ সড়কের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। এই মুহূর্তে ইসলামের হিফা-জতের জন্য সকলে ঐক্যবদ্ধ হোন, সর্বশক্তি নিয়োগ করুন, সকল বিরোধ ও মতপার্থক্য সিন্দুকে আবদ্ধ করুন। ইসলাম রক্ষা পেলে খুঁটিনাটি মত-পার্থক্যের মীমাংসা করার ফুরসত পরেও পাওয়া যাবে। তাছাড়া এগুলো মাঠে-ময়দানে আলোচনার বিষয় নয়, শিক্ষাঙ্গনের শান্ত পরিবেশই এর জন্য উপযুক্ত। অল্প ক'দিন আগে ভারতে বিশেষ মতাদর্শের এক জামাত আয়ো-জিত সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসংগে আমি বলেছিলাম---মতপার্থক্য চিরদিনই ছিল। এমন কি নামাযের ব্যাপারেও মতপার্থক্য আছে। চার মযহাবে এবং চার মযহাবের বাইরেও রয়েছে কতশত মতদ্বৈধতা। কিন্তু তা নিয়ে কখনো কোন ফ্যাসাদ কিংবা হাংগামা হয়নি, উম্মাহর মাঝে বিভেদ বা বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়নি। এ অভিশাপ শুরু হয়েছে সেদিন থেকে, যেদিন 'আলিমগণ মাদরাসার গণ্ডী পেরিয়ে জনতার সামনে তর্কযুদ্ধের সূচনা করেছেন, চৌরাস্তায় মজলিস গুলযার করেছেন। কোন মাসআলা সম্পর্কে তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হওয়া এবং উম্মী জনতার হাতে তা তুলে দেওয়াই হচ্ছে আমাদের চরম ভ্রান্তি, অমার্জনীয় অপরাধ। নইলে এসব বিতর্কতো শুরু থেকেই চলে আসছে, তাতে তো কারো সাথে কারো মনোমালিন্য হয়নি। কেউ কারো

মাথা ফাটায়নি, মানুষের জ্ঞানের পরিধি বরং তাতে বৃদ্ধিই পেয়েছে, মেধা ও চিন্তাশক্তি প্রখর হয়েছে, অনুশীলনী ও অনুসন্ধিৎসা ব্যাপকতা লাভ করেছে। একটি জীবন্ত জাতি ও প্রাণবন্ত সমাজের জন্য এটাই স্বাভাবিক যে, বিভিন্ন বিষয়ে তারা চিন্তা-ভাবনা করবে, অনুসন্ধান ও গবেষণায় লিপ্ত হবে এবং মজলিসী আলোচনায় কিংবা কলমের ভাষায় মত বিনিময় করবে। পাহারা বসিয়ে তা রোধ করা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। কিন্তু এসব বিষয় যদি উম্মী জনতার মাঝে অনুপ্রবেশ করে, যদি দলীয় বা রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের হাতিয়াররূপে ব্যবহৃত হয়, তখন তা ধারণ করে এমন চরম ধ্বসাত্মক রূপ যা কোন সমৃদ্ধ ও ঐতিহ্যবাহী জাতির বিপর্যয় ও ভরাডুবির জন্য যথেষ্ট। এগুলো নিছক ফিকহ্‌শাস্ত্রীয় বিষয়, তাত্ত্বিক বিষয়, বিদ্বান সমাজের বিষয়। গ্রন্থাগারের ভাবগম্ভীর পরিবেশে কিংবা শিক্ষাঙ্গণের আলো-চনা কক্ষে যত ইচ্ছা সেগুলোর চর্চা ও অনুশীলন করুন, কিন্তু উম্মী জনতার হাতে তা তুলে দেওয়া হলে সমাজে আরো অধিক গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে, বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতাকে আরো অধিক উৎসাহ যোগাবে। আল্লামা রূমী এর চাইতেও সাধারণ কোন বিষয় সম্পর্কেই বলেছিলেন, "মিলনের সেতুবন্ধন তৈরী করাই তোমার কাজ ; সংঘাত ও বিচ্ছেদে ইন্ধন যোগানো তোমার কাজ নয়।"

আপনাদের উপর আজ যে গুরুদায়িত্ব বর্তেছে তা একেকটি দেশ বা জাতির ভাগ্যের মীমাংসা করতে পারে। সুতরাং প্রতিটি ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বিদ্যালোচনার দুয়ার কেউ বন্ধ করতে পারে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি তো এধারণা কিছুতেই সমর্থন করতে পারি না। কেননা আমি আমার স্বভাবে আগাগোড়া একজন ছাত্র। কিন্তু সেগুলোকে রাজনৈতিক ও দলীয় পর্যায়ে নিয়ে আসার এবং হীন স্বার্থোদ্ধারের হাতিয়াররূপে ব্যবহার করার অনুমতি কিছুতেই দেওয়া যায়না। এই মুহূর্তে আমাদের করণীয় হচ্ছে পূর্ণ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্‌র কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করা এবং দেশ ও জাতিকে চিন্তানৈতিক ধর্মদ্রোহিতা থেকে রক্ষা করা।

পাকিস্তান সরকারের ওয়াক্‌ফ্‌ বিভাগ---যার সদর দফ্‌তরে বসে আজ আমরা আলোচনা করছি---এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে, পারে

চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে। কেননা আল্লাহ্‌র ফযলে আজো জনসাধারণের উপর ‘আলিম সমাজ ও ইসলামের প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে। মসজিদের মর্যাদা আজো সমুন্নত রয়েছে মানুষের হৃদয়ে। মসজিদের মিম্বর ও মিহরাব থেকে যে বাণী উচ্চারিত হবে, তা মানুষের হৃদয়ের গভীর প্রদেশে রেখাপাত করবে, অন্তর জগতে ধীরে ধীরে বিপ্লব ঘটাবে। কেননা প্রতিটি মসজিদের মিম্বরই মূলত মিম্বরে রসূলের (সা) প্রতিনিধিত্বকারী। এমন একটি বিপুল সম্ভাবনা ইসলামী উম্মাহর কল্যাণে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হলে আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ্‌র কাজে জওয়াবদিহী করতে হবে।

আমি আমার বক্তব্যের শেষ প্রান্তে এসে পড়েছি। বিদায়ের মুহূর্তে আপনাদের পুনরায় মুবারকবাদ জানাচ্ছি যে, আপনারা আমাকে সম্মানিত ‘উলামা, ইমাম ও খতীব এবং দীনদার মুসলমান ভাইদের খিদমতে আমার মনের কথা প্রকাশ করার সুযোগ করে দিয়েছেন।

ইসলামী বিশ্বে উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পন্থা

(১২ই জুলাই ১৯৭৮ইং তারিখে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ভাষণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক, বিশিষ্ট ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, লেখক, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকবৃন্দ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট অডিটোরিয়ামে স্থান সংকুলান না হওয়ায় অনেকে গ্যালারীতে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনেছিলেন।

স্বাগত ভাষণ দিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর ইহসান রশীদ এবং বিদায়ী ভাষণ দিয়েছিলেন রেজিস্ট্রার জনাব ইসমাঈল সাআদ সাহেব)।

হামদ ও সালাতের পর,

জ্ঞান অর্থ সত্যানুসন্ধান ঃ

মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর, অধ্যাপকবৃন্দ, ছাত্র-ছাত্রীগণ এবং অন্যান্য শ্রোতাবৃন্দ !

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমি ‘বিভাজন’-এর পক্ষপাতি নই। আমার বিশ্বাস এই যে, ‘ইল্‌ম ও জ্ঞান একটি অবিভাজ্য একক সত্তা যাকে আধুনিক ও প্রাচীন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এবং তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করা ঠিক নয়। আল্লামা ইকবালের ভাষায় ঃ

حدیث کم نظران قصۂ قدیم و جدید

(আধুনিক ও প্রাচীনের বিভাজন সংকীর্ণ ও অপরিপক্ক দৃষ্টির পরিচায়ক)।

‘ইল্‌ম ও জ্ঞানকে জাগতিক ও ধর্মীয়---এ দু’ভাগে ভাগ করারও আমি পক্ষপাতী নই। আমি বিশ্বাস করি যে, জ্ঞান হচ্ছে মানব জাতির সম্মিলিত ও সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফসল যা কোন দেশ বা জাতির একক মালিকানা নয় এবং হওয়া উচিতও নয়। এমনকি আমি জীবনের প্রতিভাভিত্তিক অন্যান্য উৎসের ক্ষেত্রেও দেশ ও জাতিভিত্তিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক কিংবা ভৌগোলিক বিভক্তির পক্ষপাতী নই। আমি বিশ্বাস করি যে, ‘ইল্‌ম একটি ‘অবিভাজ্য একক’। সাধারণ ব্যবহারে যাকে ‘বহু’তে বিভক্ত বলা হয়--আমার সন্ধানী দৃষ্টিতে সেখানেও একটি ‘একক সত্তার’ রূপ ধরা পড়ে। ‘ইল্‌ম ও জ্ঞানের সে ‘অবিভাজ্য ও একক সত্তা’ হচ্ছে সত্য ও সত্যের অন্বেষণ, অনুসন্ধিৎসা ও প্রাপ্তির আনন্দ। আর এসব ক্ষেত্রে কোন দেশ, জাতি বা দল ও গোষ্ঠীর একক মালিকানা হতে পারেনা। এটা আমার বিশ্বাস, আমার হৃদয়ের একান্ত অনুভব। তবু আমি মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর এবং বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আন্তরিক শোকরগুযারী করছি। কেননা তাঁরা তাঁদের ছাত্র--সন্তানদের সামনে, ইসলাম উদ্যানের এই প্রস্ফুটিত কলিগুলোর উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করার জন্য এমন এক ব্যক্তিকে মনোনীত করেছেন যার সম্পর্ক (তা সঠিক হোক কিংবা অঠিক) হলো প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে। আপনাদের এ দূরদৃষ্টি ও উদারচিত্ততার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি আমাকে দিতেই হবে যে, জ্ঞান ও সত্যের কৃত্রিম বিভাজন আপনাদের বিভ্রান্ত করতে পারেনি। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য ও কাব্য-কলার ক্ষেত্রে আমি এ নীতিতে বিশ্বাসী নই যে, যারা বিশেষ কোন উর্দি পরে হাযির হবে তারাই শুধু জ্ঞানী-গুণী বলে স্বীকৃতি পাবেন। আর যাদের গায়ে সে ধরনের কোন উর্দি নেই তাদের গুণীজনদের মজলিসে প্রবেশাধিকারও দেয়া হবে না। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, শিল্প-সাহিত্য এবং জ্ঞান ও মনীষার জগতে উপরিউক্ত মানসিকতাই বর্তমানে বিদ্যমান। দোকান খুলে, সাইন বোর্ড ঝুলিয়ে কবিতা সন্ধ্যায় আরত্তি

করে নিজেকে যিনি জাহির না করবেন, কাব্য সাহিত্যের জগতে তার আদর-কদর কোন দিন হবেনা, কপালে তার কোন দিন কল্কে জুটবেনা। নিরবে নিভৃতে ধুঁকে ধুঁকেই জীবন দিতে হবে তাকে। কত স্বভাব কবি ও প্রতিভাধর শিল্পীকে যে এভুলের নির্মম খেসারত দিতে হয়েছে কে তার ইয়ত্তা রাখে! মোটকথা, যদিও আমি 'ইল্ম ও জ্ঞানের বিশ্বজনীনতা ও সার্বজনীনতায় বিশ্বাসী, যদিও আমার নিবিড় অনুভূতি এই যে, 'ইল্ম ও জ্ঞান হচ্ছে চির-নবীন ও চির নতুন এক একক সত্তা এবং নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও সততা থাকলে দেশ-কাল-জাতি ও ধর্মভেদে আল্লাহ্‌র দান ও অনুগ্রহে বিশেষ কোন তারতম্য ঘটেনা। তবুও আমাকে বলতে হচ্ছে যে, আপনাদের এ পদক্ষেপ খুবই দুঃসাহসিক, বৈপ্লবিক ও যুগান্তকারী। সুতরাং সাধুবাদ লাভের যোগ্য। আমার একান্ত কামনা---আপনাদের এ সাহসী পদক্ষেপ অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করুক, উন্মোচিত করুক সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত। আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আধুনিক বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানানো হোক, আর বিশ্ব-বিদ্যালয় ও একাডেমিগুলোতে ডাকা হোক তাদের যারা নিষ্ঠার সাথে জ্ঞানার্জন করেছেন, মানবজাতির সঞ্চিত শিল্প-সাহিত্য ও কাব্যের অভ্যান্তরে থেকে সম্পদ আহরণের মাধ্যমে নিজেদের সমৃদ্ধ করেছেন।

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য

সুধীবৃন্দ! আমি আবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এ জন্য যে, এখানে, এই ঐতিহ্যমণ্ডিত শিক্ষাঙ্গনে সেই তরুণদের সামনে কথা বলার সুযোগ আপনারা আমাকে দিয়েছেন যারা অদূর ভবিষ্যতে এদেশের এবং সম্ভবত অপরাপর ইসলামী দেশের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আঞ্জাম দেবে, যারা ভবিষ্যতে দেশের নেতা ও কর্ণধার হবে কিংবা বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গণের পরিচালক হবে।

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং শিক্ষার প্রভাব, ফলাফল ও উপকারিতা সম্পর্কে আমার যথেষ্ট লেখাপড়া করার সুযোগ হয়েছে। তবে এখানে আমি একটি মাত্র উদ্ধৃতি আপনাদের শোনাব। ইনসাইক্লোপেডিয়া বৃটানিকায় সুপ্রসিদ্ধ বৃটিশ শিক্ষাবিদ স্যার পার্সী নিয়েন (Sir Percyneinn) শিক্ষার একটি ব্যাপক অর্থবহ ও প্রাজ্ঞ সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর ভাষায়ঃ

"শিক্ষার যে মৌলিক ধারণা গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকেই নিয়ন্ত্রণ করবে তা এই যে, 'শিক্ষা' এমন এক প্রচেষ্টা যা শিশুদের পিতা-মাতা ও অভিভাবকগণ

নিজেদের পছন্দ করা জীবন-দর্শন অনুযায়ী নতুন বংশধর তৈরীর জন্য ব্যয় করে থাকেন। শিক্ষাঙ্গণের দায়িত্ব হলো উপরিউক্ত জীবন থেকে উৎসরিত আত্মিক শক্তিকে শিশু জীবনে প্রভাব বিস্তারের পথ প্রশস্ত করে দেওয়া। শিক্ষাঙ্গণ ছাত্রকে এমন প্রশিক্ষণ দেবে যা জাতীয় জীবনের ধারা ও উন্নয়ন গতির সাথে সম্পৃক্ত হতে ছাত্রের সহায়ক হবে এবং যার আলোকে ভবিষ্যতের পথে সে তার যাত্রা অব্যাহত রাখতে পারবে" (বিশেষ নিবন্ধ "শিক্ষা"= Education)।

শিক্ষার একটি ব্যাপক সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে সব প্রচেষ্টা আমার চোখে পড়েছে সেগুলোর মধ্যে আমার মতে উপরিউক্ত সংজ্ঞাই হচ্ছে ব্যাপক-তর ও অধিকতর বাস্তবসম্মত।

শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কি? শিক্ষা খাতে একটা জাতি তার মেধা, প্রতিভা ও সম্পদের সিংহভাগ এতটা উদারতার সাথে, এমন পরিকল্পিতভাবে কেন ব্যয় করে, কি তার উদ্দেশ্য? জাতিকে তার আদর্শ ও বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত করা, তার সাংস্কৃতিক সম্পদ ও ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা কিংবা তার অভ্যাস্ত জীবন ও প্রিয়তম বিষয়গুলো থেকে বিস্মৃত করাই কি শিক্ষার উদ্দেশ্য? এত ব্যাপক উদ্যোগ ও আয়োজনের সার্থকতা? যুক্তির মাপ-কাঠিতে কোন জিনিসের প্রিয়-অপ্রিয় হওয়া নির্ধারিত হবে, প্রিয় হওয়ার যোগ্য কিনা আগে ভাগেই তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে নিতে হতে; যুক্তির এ ধরনের খবরদারি কোন জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হৃদয় মেনে নিতে পারে না। সুতরাং সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। আমি শুধু বলতে চাচ্ছি, একটি জাতির কাছে যা কিছু প্রিয়, যে আদর্শ ও বিশ্বাস, যে চিন্তাধারা ও মূল্যবোধ এবং যে ভাব ও অনুভূতি তাদের সযত্ন লালিত, সেগুলো নতুন বংশধরের কাছে সার্থকভাবে তুলে ধরাই হচ্ছে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। দীর্ঘদিনের সাধনা ও প্রচেষ্টায় পূর্বপুরুষরা যে ঐতিহ্য গড়ে তুলেছেন, যে ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ, যে স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনে তারা যুদ্ধের আগুনে ঝাঁপ দিয়েছেন, জানমাল, ইযযত-আবরূ লুটিয়ে দিয়েছেন; সে সম্পদ, সে ঐতিহ্য পরবর্তীদের হাতে তুলে দেওয়া, তাদের মনমগজে বদ্ধমূল করে দেওয়া এবং স্বভাব ও প্রকৃতিতে তা উৎরে দেওয়াই হলো শিক্ষার মহান দায়িত্ব। শিক্ষা খাতে ব্যয়ের বেলায় একটা জাতি এজন্যই এত অকুণ্ঠ, এত দরাজ দিল।

রসূলে আরাবীর উম্মতের বিন্যাস বৈশিষ্ট্য

আমি মনে করি যে, শিক্ষার উপরোল্লিখিত সংজ্ঞা যথাযথ ও সর্বাঙ্গীণ এবং বিশ্বের সকল জাতির নিকটই তা গ্রহণযোগ্য। কিন্তু এমন জাতির ক্ষেত্রে যাদের বিশ্বাস ও মূল্যবোধ মানব মস্তিষ্কপ্রসূত নয়, যাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি মানুষের হাতে গড়া নয়, যাদের জীবন ও অস্তিত্বের উৎস হলো আল-কুর-আন ও সুন্নাহ, ওয়াহীভিত্তিক চিরন্তন 'ইল্‌ম ও মহাজ্ঞানই যাদের চিন্তা ও অনুভূতির পূর্ণ নিয়ন্ত্রক, তাদের ক্ষেত্রে বিষয়টি হয়ে পড়ে আরো নাযুক ও সংবেদনশীল এবং আরো অধিকতর গুরুত্বের দাবীদার। এমন মহিমান্বিত জাতির শিক্ষা ব্যবস্থা যদি---ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে সদ্ব্যবহারের অভাবে কিংবা দেশী-বিদেশী চক্রান্তের ফলে---শিক্ষার্থীদের অন্তরে বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ভিত দুর্বল করে দেয়, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি তাদের সন্দিহান করে তোলে, মানসিক দ্বন্দ্ব ও দোদুল্যমানতায় নিক্ষেপ করে, আর সে দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতা যদি ব্যক্তি জীবনের পরিধি অতিক্রম করে জাতীয় জীবনের সর্বত্র সংক্রামিত হয় এবং ফলশ্রুতিতে জাতীয় জীবনে নামে প্রলয়ংকরী ধ্বংস, শিক্ষা যদি জাতির নতুন সম্প্রদায়কে এবং শিক্ষিত শ্রেণীকে বিশ্বাস ও মূল্যবোধ, চিন্তা ও ভাবধারা এবং ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ও সংঘাতমুখী করে তোলে, তবে নিরপেক্ষতা ও সত্যপ্রীতির খাতিরে বলতেই হবে যে, সে শিক্ষা আলো নয়, আঁধার; সে শিক্ষা কল্যাণ নয়, অভিশাপ; সে শিক্ষা অগ্রগতির মাধ্যম নয়, বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার উৎস। কেননা একথা আমি স্বীকার করি না যে, ইসলাম একটি উত্তরাধিকার সম্পদ বা ঐতিহ্য মাত্র। এজন্যই Legacy of Islam কিংবা Heritage of Islam এর উপর লিখিত গ্রন্থাবলী আমার চোখে খুব বেশী প্রশংসার যোগ্য নয়। আমার বিশ্বাস ও কর্মের জগতে ইসলাম একটি বিশ্বজনীন ও সার্বজনীন জীবন দর্শন। ইসলাম যুগের সহচরই শুধু নয়, যুগের পথপ্রদর্শকও। ইসলাম শুধু জীবন কাফেলার সাধারণ যাত্রীই নয়, কাফেলার নিয়ন্ত্রক এবং তত্ত্বাবধায়কও। সুতরাং যে শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিণামে ব্যক্তি ও জাতি তার ঐতিহ্য থেকে দূরে সরে পড়ে, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে, ধর্মকে মনে করে বসে শিশুর মনভুলানো ছড়া বা খেলনা মাত্র--সে শিক্ষা ব্যবস্থাকে দেশ ও জাতির জন্য এক মূর্তিমান অভিশাপ ছাড়া আর কিছু আমি ভাবতে পারি না।

ইসলামী দেশের জন্য বিষয়টি আরো গুরুত্বপূর্ণ

এ মুহূর্তে আমি আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বললেও আমার চোখের সামনে ভাসছে গোটা ইসলামী বিশ্বের মানচিত্র। আমার সামনে রয়েছে মিসর, সিরিয়া ও ইরাকসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশের সামাজিক পরিবেশ ও শিক্ষাব্যবস্থার বাস্তব চিত্র। মাত্র কয়েক মাস আগে সৌদী আরবে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিশ্ব ইসলামী শিক্ষা সম্মেলন (All world Islamic education conference)। পাকিস্তান থেকে ইহসান রশীদ সাহেব এবং জনাব এ. কে. ব্রোহী সেখানে গিয়েছিলেন। ভারতের পক্ষে আমি অংশ গ্রহণ করেছিলাম। সেখানে আমার পঠিত প্রবন্ধে আমি বলেছিলাম---"বিষয়টি কোন ইসলামী দেশের হলে তা আরো নাযুক ও জটিল হয়ে পড়ে। কেননা প্রতিটি ইসলামী দেশের জনগোষ্ঠীরই রয়েছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয় জাতীয় সত্তা, তাদের রয়েছে আলাদা ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ, রয়েছে আলাদা আদর্শ ও জীবনবোধ। পৃথিবীর বুকে এক মহা দায়িত্ব সম্পাদনের কঠিন সংগ্রামে তারা নিয়োজিত। এমন আদর্শবাদী জাতির এবং এমন অগ্রণী দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ভূমিকা যদি হয় নেতিবাচক, সে শিক্ষাব্যবস্থার কোলে লালিত তরুণ সম্প্রদায় যদি জাতীয় বিশ্বাস, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ থেকে হয়ে পড়ে বিচ্ছিন্ন, তাহলে অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরূপেই সেখানে দেখা দেয় আধুনিক ও রক্ষণশীলের ঝগড়া। এমন এক নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হয়, যারা বৃহত্তর সমাজের সাথে নিজেদের খাপ-খাওয়াতে পারে না কিছুতেই। তারা হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ভিন্ন জগতের বাসিন্দা। তাতে দেখা দেয় নতুন জটিলতা, সৃষ্টি হয় নবতর সমস্যা; এক নতুন প্রতিবন্ধকতা বিঘ্নিত করে জাতীয় জীবনধারাকে।

যে দেশ ও জাতির বিশ্বাস ও মতবাদ, ঐতিহ্য ও চিন্তাধারার বুনিয়াদ হচ্ছে আসমানী ওয়াহী, সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থার পরিণতি যদি হয় মানসিক দ্বন্দ্ব-বিশৃঙ্খলা, পরিবার, সমাজ ও পরিবেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং আল্লাহ তাকে যে দায়িত্ব, কর্তব্য ও পদমর্যাদা দান করেছেন সেগুলোর প্রতি উদাসীনতা ও নির্লিপ্ততা--তাহলে আমি বলব, সে শিক্ষার নাম জাতীয় সেবা নয়--জাতীয় দুর্দশা।

ইসলামী রাষ্ট্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কর্তব্য

আশা করি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে আপনার আমার বক্তব্য বিচার করবেন। কেননা বিশেষ কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা তার কর্তৃপক্ষ আমার বক্তব্যের লক্ষ্য

নয়। নিছক একটি মৌলিক বিষয় হিসাবে আমি বলছি--কোন ইসলামী রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রধান কর্তব্য হলো, জাতি যে আদর্শ ও মূল্যবোধ, যে বৈশিষ্ট্য ও জীবনধারা, যে ঐতিহ্য ও চিন্তাধারা এবং যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক--সেগুলোর প্রতি শিক্ষার্থীর মনে আস্থা ও বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দেওয়া। সে বিশ্বাস একজন সাধারণ মানুষের, ফুটপাতের বাসিন্দার এবং ভাসমান নাগরিকের বিশ্বাস হবে না, সে বিশ্বাস হবে একজন সুশিক্ষিতের, একজন চৌকষ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকের, যার মন ও মগজ একই সাথে অনুগত ও আশ্বস্ত হবে। কবি ইকবালের ভাষায়ঃ এমন যেন না হয়, "অন্তরে ঈমানদার সে, চিন্তায় কাফির।"

ব্যক্তি ও সমষ্টির দ্বন্দ্ব-সংঘাত যেমন বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে, তেমনি ব্যক্তির জীবনে মন ও মস্তিষ্কের বিরোধও ডেকে আনে বড় ধরনের বিপর্যয়। সুতরাং কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা যদি জাতীয় জীবনে এমন দ্বন্দ্ব-সংঘাতের জন্ম দেয় তবে তা দেশ ও জাতির জন্য বিরাট দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

মন ও মস্তিষ্ক উভয়ের আশ্বস্ত হওয়া অপরিহার্য

আপনারা আমাকে 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের লক্ষ্য ও কর্মপন্থা' সম্পর্কে আলোচনার অনুরোধ জানিয়েছেন। আমার মতে, ইসলামী রাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থী তরুণ সম্প্রদায়ের অন্তরে উপরিউক্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে আস্থা ও বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দেওয়া, যে বিশ্বাসের উৎস হলো জ্ঞান ও অধ্যয়ন এবং আত্মোপলব্ধি ও তুলনামূলক পর্যালোচনা। সে বিশ্বাসের সাথে মস্তিষ্কের আনুগত্য ও শান্তিও থাকতে হবে। কেননা বিশ্বাস যদি ভক্তির পর্যায়েই সীমাবদ্ধ হয়, সে বিশ্বাসে মস্তিষ্ক কিছুতেই আশ্বস্ত হতে পারে না। ফলে অস্তিত্ব রক্ষার ত্যাগিদেই তখন মস্তিষ্ক ও বুদ্ধিবৃত্তির টুটি চেপে ধরতে হয়। এতে হৃদয়ের সাথে মস্তিষ্কের এবং বুদ্ধিবৃত্তির সাথে ভক্তির শুরু হয় সংঘাত। বিভিন্ন অমুসলিম জাতির ইতিহাস মূলত হৃদয় ও মস্তিষ্কের এবং ভক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির সংঘাতেরই ইতিহাস। ধর্মের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই তাদের আপ্রাণ চেষ্টা—জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি অনুরাগ যেন কখনো জাগ্রত না হয়, কেননা তা হচ্ছে সে ধর্মের মৃত্যুরই নামান্তর। কিন্তু মানব মনের জ্ঞানস্পৃহা ও স্বভাব অনুসন্ধিৎসাকে স্বর্গ-নরকের লোভ-ভীতিতে দাবিয়ে

রাখা সম্ভব নয়। এ শাশ্বত সত্যকে অস্বীকার করার ফলশ্রুতিতেই রচিত হয়েছে গির্জা ও বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কলংকময় ইতিহাস। ড্রেপ্যার রচিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ Conflict Between Religons & Science -এর পাতায় পাতায় বিধৃত হয়েছে সে যুগের অনেক লোমহর্ষক কাহিনী।

এ সংঘর্ষের পিছনে কি কারণ সক্রিয় ছিল? গির্জার বিশ্বাস ছিল এই যে, ধর্ম ততদিনই টিকে থাকবে, গির্জার প্রভাব ততদিনই অক্ষুণ্ণ থাকবে, মানুষের বোধ ও উপলব্ধি যতদিন ঘুমিয়ে থাকবে, চেতনা ও অনুসন্ধিৎসা যতদিন ঝিমিয়ে থাকবে। সুতরাং মানুষের জ্ঞানের পরিধি যত সংকীর্ণ হবে এবং মনীষার জগতে মানুষের দৈন্য যতটা প্রকট হবে, খৃস্টধর্ম ততটাই সজীবতা লাভ করবে এবং বাইবেলের প্রতি মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তারা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মনীষার পথে বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল, মানুষের চিরন্তন অনুসন্ধিৎসার পথে ধর্মের পাঁচিল তুলে দিল। মোটকথা, গির্জা ও বিজ্ঞান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিরূপে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলো এবং প্রকৃতির অমোঘ ধারায় মানুষের দুর্দমনীয় জ্ঞানস্পৃহা ও অনুসন্ধিৎসার জয় হলো। বিজ্ঞানের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রার সামনে গির্জাকে আত্মসমর্পণ করতে হলো। কেননা জ্ঞান হলো মানুষের স্বভাবধর্ম, হৃদয়ের আবেগ, আত্মার দাবী এবং মানব সভ্যতার অপরিহার্য প্রয়োজন। জ্ঞান হলো আল্লাহ্‌র এক মহা দান। ফলে-ফুলে সুশোভিত হওয়ার জন্যই তো জ্ঞান বৃক্ষের জন্ম। এক কথায়, জ্ঞান হলো চিরন্তন সত্য। আর সত্যের কোন মৃত্যু নেই, পরাজয় নেই, এ অভিশপ্ত ঘটনার ক্ষেত্র খৃস্টধর্ম অধ্যুষিত ইউরোপ হলেও তার বিষক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ল গোটা বিশ্বে। কম-বেশি সব ধর্মের উপরই পড়ল তার অশুভ প্রভাব। বীতশ্রদ্ধ ও ভাবাবেগ তাড়িত মানুষ খুব সহজেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, সভ্যতার মহা কাফেলায় জ্ঞান ও ধর্মের সহযাত্রা কিছুতেই সম্ভব নয়, সম্ভব নয় বিজ্ঞান ও বিশ্বাসের সহাবস্থান। ইতিহাসের একজন বিশ্বস্ত ছাত্র হিসাবে দুঃখের সাথে একথা আমাকে স্বীকার করতেই হয় যে, ইসলামী বিশ্বের কোন কোন দেশেও গির্জা-বিজ্ঞান সংঘর্ষের সে বিষক্রিয়া সাময়িকভাবে বিস্তার লাভ করেছিল কিন্তু তা খুব বেশী দিন স্থায়ী হতে পারেনি। খৃস্টান জগতের সে অপচ্ছায়া খুব দ্রুতই অপসৃত হয়ে গেছে। কেননা, ইসলাম জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, পৃষ্ঠপোষক; জ্ঞান, ও মনীষার স্বতস্ফূর্ত বিকাশই বরং ইসলামের দাবী।

জ্ঞান ও কলম ইসলামের জন্ম সহচর

আমি মনে করি, ইসলামী রাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের একটি গুরু দায়িত্ব হলো জ্ঞান ও ধর্মের মাঝে এবং বিজ্ঞান ও বিশ্বাসের মাঝে বিরোধ ও ব্যবধান সৃষ্টি হতে না দেওয়া। যেসব ধর্মের সাথে জ্ঞান ও মনীষার কোন সংযোগ নেই, মানুষের অনুসন্ধিৎসা ও বুদ্ধিবৃত্তির স্পর্শ বাঁচিয়ে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের চোখে ধূলো দিয়ে যে সব ধর্মের উন্মেষ ও যাত্রা, সেসব ধর্মের ক্ষেত্রে বিরোধ-ব্যবধানের অবকাশ হয়ত আছে। কিন্তু যে ধর্ম মানবতার উদ্দেশ্যে উচ্চারিত তার প্রথম আহবানেই ‘ইলমের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা ঘোষণা করেছেঃ পড়ো (হে মুহাম্মদ!) তোমার প্রতিপালকের নাম নিয়ে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পড়ো, তোমার প্রতিপালক যে খুবই বদান্য; যিনি কলম দ্বারা জ্ঞান দান করেছেন। মানুষ যা জানত না তা তিনি তাকে জানিয়েছেন।

যে ধর্ম তার ওয়াহীর প্রথম কিস্তিতে এবং কল্যাণ ও রহমতের প্রথম পশলা বর্ষণেও নগণ্য কলমের কথা ভুলে যায়নি, ভুলে যায়নি কলমের সাথে ‘ইল্‌মের ভাগ্যবিজড়িত হওয়ার রহস্য, সে ধর্মের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত বিরোধ ব্যবধানের অবকাশ কোথায়! ভেবে দেখুন, হেরা গুহার নির্জনতায় মানবতার জন্য কল্যাণ ও হিদায়াতের পয়গাম লাভ করছেন এক উম্মী নবী, কলমের সাথে মুহূর্তের পরিচয়ও যাঁর ঘটেনি কোনদিন। স্তব্ধ বিস্ময়ে, পুলক মুগ্ধতায় আকাশ ও পৃথিবী সেদিন প্রত্যক্ষ করল, এমন এক দেশে যেখানে বিদ্যাভ্যাস ও জ্ঞান-চর্চার প্রচলন ছিলনা। বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা কেন্দ্র ছিলনা, এমন কি ছিলনা বর্ণপরিচয় লাভের ন্যূনতম ব্যবস্থাও। সেই উম্মী দেশে, উম্মী জাতির মাঝে, উম্মী নবীর উপর অবতীর্ণ হচ্ছে ওয়াহী, প্রথম আসমানী ওয়াহী, কিন্তু সে ওয়াহীর প্রথম শব্দ اعبد (ইবাদত করো) নয়, صل (নামায পড়ো) নয়, সে ওয়াহীর প্রথম শব্দ হলো اقرأ (পড়ো)। নিজে যিনি লেখাপড়া জানেন না, তাঁর উপর অবতীর্ণ প্রথম ওয়াহীতেই তাঁকে সম্বোধন করা হচ্ছে, পড়ো। কোথায় এর রহস্য? কি এর তাৎপর্য? কেননা তোমার উম্মত হবে জ্ঞান-পিপাসু, জ্ঞানের সেবক, বিজ্ঞানের ধারক ও বাহক। তুমি যে যুগের নবী তা অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতার যুগ নয়, জ্ঞান বিদ্বেষ ও নাশকতার যুগ নয়—বিজ্ঞানের যুগ, দর্শন ও বুদ্ধিবৃত্তির যুগ, অগ্রগতি ও বিনির্মাণের যুগ, তা মানব সাম্য ও

সম্প্রীতির যুগ। বস্তুত মানব সভ্যতা ও ধর্মের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই প্রথম অভিজ্ঞতা যে, উম্মী জাতির মাঝে, উম্মী নবীর উপর অবতীর্ণ ওয়াহীর প্রথম সম্ভাষণ হচ্ছে اقرأ باسم ربك পড়! তোমার প্রতিপালকের নামে।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য ছিল এই যে, মহান স্রষ্টা ও প্রতিপাল-কের সাথে ‘ইল্‌মের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ফলে সঠিক পথ থেকে তা বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল। মানব জাতির উদ্দেশ্যে প্রেরিত আল-কুর-আনের প্রথম ওয়াহীতে রবের সাথে ‘ইল্‌মের সেই দিন সংযোগ পুনপ্রতিষ্ঠা করা হলো। ‘ইল্‌মেকে দেওয়া হলো প্রথম ওয়াহীর মর্যাদা। সেই সাথে সতর্ক করে দেওয়া হলো যে, আল্লাহ্‌র নামে ‘ইল্‌মের সূচনা হতে হবে। কেননা ‘ইল্‌ম তাঁরই দান, তাঁরই সৃষ্টি। সুতরাং তাঁরই পথ-নির্দেশনা ও হেদায়াতের আলোকে তা মানবতার জন্য কল্যাণকর ও ফলপ্রসূ হতে পারে। যে বাণী আজ আমি আপনাদের শোনাচ্ছি তা এমনি এক বিপ্লবাত্মক ও জলদগম্ভীর বাণী যা ইতিপূর্বে পৃথিবী আর কোনদিন শোনেনি। এমনকি কারো পক্ষে তা কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না। এ ছিল সংকীর্ণ মানব কল্পনার বহু উর্ধ্বের ব্যাপার। সেদিন যদি পৃথিবীর তাবৎ জ্ঞানী-গুণী, সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের মহাসম্মেলন ডেকে জিজ্ঞাসা করা হতো—বলুন দেখি, মানব জাতির জন্য প্রথম যে ওয়াহী অবতীর্ণ হতে যাচ্ছে তার প্রথম শব্দ কি হবে? কোন বিষয়টি অগ্রাধিকার লাভ করবে? আমার স্থির বিশ্বাস সেই উম্মী জাতির স্বভাব-প্রকৃতি এবং মন-মানসিকতার প্রেক্ষিতে হয়ত অনেক জ্ঞানগর্ভ জওয়াবই তারা দিতেন। কিন্তু এমন কথা তাঁরা কিছুতেই বলতে পারতেন না যে, আসন্ন ওয়াহীর প্রথম শব্দ হবে اقرأ —‘পড়’। দেখুন, এখানে শুধু জ্ঞান অর্জনের কথা বলা হয়নি। علم শব্দটি প্রয়োগ করা হয়নি। জ্ঞান অর্জনের জন্য কাগজ কলম কালি জরুরী নয়। তা প্রকৃতি প্রদত্তও হতে পারে। এখানে اقرأ শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে। পড়ার সম্পর্কে রয়েছে কাগজের সাথে, কলমের সাথে, বইপুস্তকের সাথে, পাঠাগার ও প্রকাশনা সংস্থার সাথে, শিক্ষাঙ্গণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে, সাধনা ও মেধার সাথে এবং অধ্যয়ন ও অনুশীলনের সাথে। পড় তোমার প্রতিপালকের নাম নিয়ে যিনি সৃষ্টি করেছেন।

এ ধর্ম 'ইল্‌ম থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না

প্রথম ওয়াহীতেই এ ধর্মের চরিত্র ও প্রকৃতি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে যে, 'ইল্‌ম থেকে তা কোনদিন বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। যাদের প্রতি সর্বপ্রথম আসমানী নির্দেশ হলো 'পড়'—তাদের লেখাপড়া না করে উপায় কি? 'ইল্‌মের সাথে যে মুসলমানের সংযোগ বিচ্ছিন্ন সে সত্যিকারের মুসলমান হতে পারে না, ইসলামের সত্যিকার প্রতিনিধি হওয়ার দাবীদার হতে পারে না।

মোটকথা, প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি বিপ্লবী আহবান হলো 'পড়', اقرأ باسم ربك الذى خلق। আপন প্রতিপালকের নাম নিয়ে পড় এবং তাঁরই হিদায়াত ও পথ-নির্দেশনার আলোকে এ সফর শুরু কর। কেননা এ বড় দীর্ঘ সফর। বড় কঠিন ও দুর্গম সফর। অত্যন্ত বিপদসংকুল এ পথ। এখানে পদে পদে রয়েছে গভীর খাদ। পথের বাঁকে বাঁকে ওঁৎ পেতে আছে তস্কর, যারা সুযোগ পেলে লুট করে নেবে কাফেলার সর্বস্ব। এখানে ঝোঁপে-ঝাড়ে লুকিয়ে আছে বিষাক্ত সাপ, বিচ্ছু। কাজেই এ সফরে চাই একজন সর্বদর্শী ও সর্বজ্ঞানী পথপ্রদর্শকের নির্ভুল পথ-নির্দেশনা। এ পথপ্রদর্শক হলেন বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার স্রষ্টা আল্লাহ্ পাক। তাই নির্দেশ হয়েছেঃ اقرا باسم ربك الذى خلق। পড়, তবে অন্তঃসারশূন্য 'ইল্‌ম নয়; সে 'ইল্‌ম নয় যা মানুষে মানুষে সৃষ্টি করে সংঘাত-সংঘর্ষ, জাতিতে জাতিতে সৃষ্টি করে হানাহানি। সে 'ইল্‌ম নয় যা মানুষকে করে তোলে স্বার্থপর, উদরসর্বস্ব; বরং

اقرأ باسم ربك الذى خلق، خلق الانسان من علق' اقرأ

و ربك الاكرم الذى علم بالقلم' علم الانسان مالم يعلم -

পড় তোমার প্রতিপালকের নাম নিয়ে, যিনি সৃষ্টি করেছেন; সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পড়; তোমার প্রতিপালক বড় দয়ালু। তোমাদের প্রয়োজন ও দুর্বলতা সম্পর্কে তাঁর চেয়ে ভালো কে জানবে? اقرأ و ربك الاكرم الذى علم بالقلم। বলুন দেখি, কলমকে এত বড় মর্যাদা আর কে দিতে পেরেছে? আমার মনে হয় গোটা আরব তন্নতন্ন করে খুঁজলেও কোন এক ওয়ারাকাহ বিন নওফেলের ঘরেই হয়ত তার সন্ধান পাওয়া

যেত। তৎকালীন আরবী সাহিত্য ও আরবী কবিতার গোটা ভাণ্ডার আপনি খুলে বসুন; এক-দু'জায়গাতেই হয়ত আপনি কলমের দেখা পাবেন। কিন্তু হেরা গুহায় প্রথম ওয়াহী সেই অবহেলিত কলমের কথা বিস্মৃত হয়নি।

আল্লাহ মানুষকে শিখিয়েছেন যা সে জানত না

প্রথম ওয়াহীর আরেকটি বিপ্লবী বাণী এই যে, 'ইল্‌মের কোন শেষ নেই, জ্ঞানের কোন সীমা-সরহদ নেই। علم الانسان مالم يعلم বিজ্ঞানের মূল কথা কি? প্রযুক্তির শেষ কথা কি? علم الانسان مالم يعلم মানুষের চন্দ্র বিজয়, মঙ্গল গ্রহের অভিযান, সৌর কিরণ হাতের মুঠোয় এনে তারকালোকের রহস্যোদ্ধার প্রয়াস আমাদের সামনে কোন সত্য তুলে ধরে? علم الانسان مالم يعلم মানুষ ক্ষুদ্র, তার জ্ঞান ক্ষুদ্র, আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞানী, তিনিই মানুষের শিক্ষক।

আমার বক্তব্যের সার-কথা হলো, যে উম্মতের গোড়াপত্তন হয়েছে পড়ার মাধ্যমে, যে আদর্শের উদ্বোধন হয়েছে কলমের আলোচনার মাধ্যমে, সে জাতির সে ধর্মের সম্পর্ক কলম থেকে কোনদিন বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। সুতরাং আমাদের করণীয় বিষয় হলো, এ উম্মাহ্‌র জন্য যখনই কোন বিদ্যাপীঠ ও শিক্ষাঙ্গণ প্রতিষ্ঠা করা হবে কিংবা কোন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে, তখন তার মৌলিক ও বুনিয়াদী বিষয় হবে এই যে, সে শিক্ষা ব্যবস্থা যেন জাতীয় ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতি ও জীবনদর্শনের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসকে দৃঢ় ও গভীর করে তোলে। তদুপরি সে বিশ্বাস যেন নিছক হৃদয় নির্ভর না হয়; বরং তা যেন হয় যুগপৎ মন ও মস্তিষ্ক নির্ভর। মন ও মস্তিষ্ক উভয়টি যদি আশ্বস্ত না হয় তাহলে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরূপে ব্যক্তি জীবনে দেখা দেবে দ্বন্দ্ব, মানসিক সংঘাত ও অস্থিরতা। ক্রমান্বয়ে তা ছড়িয়ে পড়বে জাতীয় জীবনের সর্বত্র। তরুণ বংশধর ও নবীন সম্প্রদায় সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি হয়ে উঠবে বিদ্রোহী।

মোটকথা, বিশ্ববিদ্যালয় তথা উচ্চতর শিক্ষাঙ্গণের মূল উদ্দেশ্য হবে ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস দৃঢ় করা এবং মন ও মস্তিষ্ক উভয়কে সেগুলোর প্রতি বিশ্বস্ত করে তোলা। এক দিকে সে বিশ্বাস তাদের অন্তরের অন্তস্থলে বদ্ধমূল হবে, অন্যদিকে তাদের মেধা ও মস্তিষ্ক তার সপক্ষে যুক্তি ও প্রমাণ সরবরাহ করবে। কাজেই আমি মনে করি, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের

প্রতি নতুন বংশধর, নবীন শিক্ষিত সমাজ, বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের আস্থা ও বিশ্বাস দৃঢ় করে দেওয়ার মাঝেই শিক্ষাব্যবস্থার সফলতা ও সার্থকতা নিহিত। একটি সফল শিক্ষা ব্যবস্থা তার শিক্ষার্থীদের অবশ্যই এতটা যোগ্য করে তুলবে যাতে তাদের মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তি তাদের বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সপক্ষে যুক্তি-প্রমাণের যোগান দিতে পারে, পৃথিবীর প্রাচীন ও আধুনিক জ্ঞান ভাণ্ডারকে জাতীয় ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের অনুকূলে ব্যবহার করতে পারে।

চরিত্র গঠন

ইসলামী রাষ্ট্রে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পরবর্তী দায়িত্ব হলো আদর্শ চরিত্র গঠন। জাতিকে বিশ্ববিদ্যালয় এমন আদর্শ নাগরিক উপহার দেবে, ইকবালের ভাষায় ঃ একমুঠো চালের বিনিময়ে যারা বিবেকের বলি দেবে না (কবি কাজী নজরুলের ভাষায় ঃ শির দেবে তবু আমামা দেবে না) আধুনিক বিশ্বের জড়বাদী দর্শন মতে, বাজারে মুদ্রার দরে সব কিছুরই বেচা-কেনা সম্ভব। অল্প মূল্যে না হলে অধিক মূল্যে অবশ্যই তা হাতের নাগালে পাওয়া যাবে। মানবতার প্রতি আধুনিক জড়বাদী দর্শনের এ দর্পিত চ্যালেঞ্জের জওয়াব আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অবশ্যই দিতে হবে। এমন উন্নত চরিত্র ও আদর্শ ইসলামী ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার মধ্যেই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত সাফল্য নিহিত, যারা কোন মূল্যেই বিবেকের সওদা করতে রাযী হবে না। পৃথিবীর কোন শক্তি, কোন ধ্বংসাত্মক দর্শন, কোন বাতিল মতবাদ কিংবা কোন স্বৈরাচারী সরকার যাদের ইস্পাত কঠিন ব্যক্তিত্বে সামান্য ফাটলও ধরাতে পারবে না। রঙীন জীবনের হাজারো প্রলোভন জয় করে এবং বিলাসী ভবিষ্যতের হাতছানি হেলায় উপেক্ষা করে ইকবালের ভাষায় যারা বলতে পারবে ঃ

اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی
جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی

"হে শূন্য লোকের বলাকা ! যে অন্ন অসীমের পথে তোমার উড্ডয়নে ব্যাঘাত ঘটায় সে অন্নের তুলনায় মৃত্যুই শ্রেয়।"

চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—মানব সেবা এবং মানবতার প্রতি দরদ ও প্রেমের অনুভূতি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে বেরিয়ে আসা তরুণদের হতে হবে মানবতার কল্যাণে উৎসর্গিতপ্রাণ।

আত্মত্যাগের মধ্যে তারা পাবে ভোগের আনন্দ। ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন তুলে দিয়ে অনাহারে রাত কাটানোতে তারা অনুভব করবে-উদর পূর্তির চেয়ে বড় আনন্দ। পাওয়ার আনন্দের চেয়ে হারানোর আনন্দই তাদের কাছে হবে অধিক অর্থময়। তারুণ্যের উদ্যম-উষ্ণতা, মেধা ও প্রতিভার শ্রেষ্ঠ ফসল এবং শিক্ষাঙ্গণ থেকে তাদের আঁচল ভরে দেওয়া জ্ঞান সম্পদ তারা ব্যয় করবে দেশ ও জাতির কল্যাণে এবং দীন ও মিল্লাতের সেবায়। তাদের জীবন-যৌবন, সুখ-শান্তি ও যশ প্রতিষ্ঠা সব উৎসর্গ হবে আদর্শ সমাজ গড়ার কাজে এবং আদর্শবান জাতি গঠনের সাধনায়। এ দুটি গুণ সৃষ্টিই হলো একটি দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষাঙ্গণ তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র দায়িত্ব, অর্থাৎ মন ও মেধা এবং চিন্তা ও মানসকে পরস্পরের সহযোগী করে গড়ে তোলা এবং প্রতিটি তরুণকে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও সেবাব্রতী আদর্শ তরুণে পরিণত করা।

আসলে দেখবার বিষয় হলো ঃ আপনাদের শিক্ষাঙ্গণে উচ্চতর যোগ্যতা, প্রতিভা ও আদর্শবান নাগরিক কি হারে তৈরী করছে? আমি স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাধিক্য কিংবা পাসের উচ্চহার আজকাল কোন দেশের উন্নতি-অগ্রগতির মাপকাঠিরূপে গ্রহণযোগ্য নয়। এ ধরনের সংকীর্ণ চিন্তাধারা আজ বর্জিত। বিজ্ঞান ও সভ্যতার এ অগ্রগতির যুগে কোন জাতির উন্নতির সঠিক মাপকাঠি হচ্ছে এই যে, জ্ঞানের সেবায় এবং অনুসন্ধান ও গবেষণার পথে জীবন উৎসর্গ করার মত জ্ঞান পাগল লোকের সংখ্যা সেখানে কি পরিমাণে বিদ্যমান ? এমন তরুণ বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা সেখানে কত, যারা পার্থিব লোভ-লালসা ও বিলাস-সম্পদ দু পায়ে ঠেলে ব্যক্তি উন্নতি এবং ব্যক্তি প্রতিষ্ঠার মোহ বর্জন করে নিজেদের উৎসর্গ করবে জাতির উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি অর্জনের মহান কর্মযজ্ঞে।

আসল মানদণ্ড এটাই, দেখতে হবে তরুণদের মাঝে এমন বিদগ্ধজনের সংখ্যা কত, যারা পার্থিব সুখ-শান্তি ও বিলাস-ঐশ্বর্য উপেক্ষা করে জ্ঞান সাধনার নির্জন গুহাবাসকেই মনে করবে জীবনের পরম সৌভাগ্য। একেকটি গবেষণা কর্মে এবং নতুন তত্ত্ব আবিষ্কারে যাদের কেটে যাবে নিরলস দিন ও বিনিদ্র রাত। একটি শক্তিশালী দেশ এবং একটি জাগ্রত জাতি হবে যাদের জীবনের প্রথম ও শেষ স্বপ্ন।

উল্লিখিত দু'টি বিষয়ই হবে কোন শিক্ষাঙ্গণের মূল লক্ষ্য। অন্যথায় শুধু লেখা-পড়া শিখিয়ে দেওয়া কিংবা বিভিন্ন পেশায় চাকুরীর যোগ্যতা

সৃষ্টি করে দেওয়া আমার বিচারে এ যুগের কোন বিদ্যাপীঠের জন্য বিষয় হতে পারে না। পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে আমি বলতে পারি যে, আমাদের মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর সাহেব তার বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এমন ভূমিকা ও অবস্থান কিছুতেই গৌরবজনক মনে করবেন না, যে শিক্ষা জীবন শেষে শিক্ষার্থীরা নিয়োজিত হবে অফিস-আদালত, কলকারখানা, বাণিজ্য কেন্দ্র ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন পদে বিভিন্ন চাকুরীতে। এরপর তারা হারিয়ে যাবে পৃথিবীর বিশাল জনসমুদ্রে, ভেসে যাবে ভোগবাদী জীবনের সর্বনাশা স্রোতে, এভাবে অবসান ঘটবে লক্ষ্যহীন, কর্মহীন ও আদর্শহীন অসংখ্য জীবনের, যে জীবন দেশ, জাতি ও ধর্মের জন্য ত্যাগ ও কুরবানীর মহিমায় ভাস্বর নয়, নয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তৃত অঙ্গনে কোন অবদানের গৌরবে মহীয়ান।

শিক্ষার লক্ষ্য অনন্ত জীবনের আকুতি

এমন এক সন্ধিক্ষণে, এমন এক ঐতিহ্যমণ্ডিত ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দেশে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কর্মকাণ্ড ও গতিময়তার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে, ইসলামী বিশ্বের দেশে দেশে শতাব্দীব্যাপী বিরাজমান চিন্তানৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দ্বন্দ্ব ও নৈরাজ্যের অবসান ঘটানো। বস্তুত পশ্চিমা সভ্যতা ও পশ্চিমা রাজনীতির অনুপ্রবেশের অভিশাপরূপে আমাদের আকীদা-বিশ্বাসে ও ধ্যান-ধারণার বুনিয়াদে নেমে আসে এক প্রলয়ংকরী ধ্বংস; চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির জগতে দেখা দেয় চরম নৈরাজ্য ও অস্থিরতা। ফলে সম্পূর্ণ নেতিবাচক কর্মকাণ্ডেই ব্যয়িত হচ্ছে দীন প্রচারক ও দাওয়াত কর্মীদের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা ও শক্তি। এ অস্বাভাবিক অবস্থার আশু অবসান একান্ত জরুরী। কেননা যাবতীয় প্রচেষ্টা ও উদ্যম এখন নিবেদিত হওয়া উচিত গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে এবং নবতর বিনির্মাণপ্রয়াসে। প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য, কাব্য, ললিতকলা, দর্শন, বিজ্ঞান, রচনা ও গবেষণা ইত্যাদির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে বিশ্বাসের নবতর ভিত্তি স্থাপন করা, নতুন উদ্যম ও নতুন প্রাণ সঞ্চার করা।

এখন আমি আপনাদের খিদমতে আল্লামা ইকবালের একটি কবিতা আবৃত্তি করব। এ কবিতা জনৈক সাহিত্যসেবীকে লক্ষ্য করে রচিত হলেও আমাদের অবস্থার ক্ষেত্রে তা পুরোপুরি প্রযোজ্য।

"হে সন্ধানী! তোমার অনুসন্ধিৎসা হয়ত সীমাহীন। কিন্তু সত্য উদ্ঘাটনে ব্যর্থ যে অনুসন্ধিৎসা তার সার্থকতা কোথায়? কবির কাব্য-চর্চা, গায়কের সুর সাধনা আর ভোরের মৃদুমন্দ বায়ু উদ্যানের সজীবতাই যদি না আনল, তবে তার মূল্য কি! অনন্ত জীবনের জন্য হৃদয়ে উত্তাপ সৃষ্টি করাই যে জ্ঞান সাধনার লক্ষ্য, ফুলকির ন্যায় ক্ষণিকের জ্বলে উঠায় কি বা আসে যায়।"

পাকিস্তানের এ পাকভূমিতে বসবাসকারী ইসলামী উম্মাহকে জাগিয়ে তোলার জন্য আজ প্রয়োজন এক প্রচণ্ড আঘাতের। কোন জাতির ভাগ্য কিশ্‌তি এছাড়া কখনো নাগাল পায় না নিরাপদ সবুজ দ্বীপের। আজ পাকিস্তান যে নাযুক পরিস্থিতির মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে তার সফল মুকাবিলার জন্য প্রয়োজন এক অলৌকিক পরিবর্তনের। জীবন ও ভাগ্যের মোড় পরিবর্তনের সে অলৌকিক শক্তি নিহিত রয়েছে ইসলামের শাশ্বত বিধান ও চিরন্তন পয়গামের মাঝে। কবির ভাষায়ঃ

"অলৌকিক শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া কোন জাতির উত্থান সম্ভব নয়। মূসা কলীমের ন্যায় প্রচণ্ড আঘাত না হানলে সে কৌশল ব্যর্থ হতে বাধ্য।"

পাকিস্তানের ইসলামী উম্মাহ্‌র ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য আজ প্রয়োজন মূসা কলীমের ন্যায় তেমনি এক প্রচণ্ড আঘাতের। কেননা গোটা আরব ও ইসলামী উম্মাহর নির্জীব দেহে নতুন প্রাণ সঞ্চারের মহা দায়িত্ব আজ পাকিস্তানের। ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্রতি আস্থা ও নির্ভরতা ফিরিয়ে আনা এবং দ্বিধাগ্রস্তদের মনে নতুন উদ্দীপনা ও স্বতঃস্ফূর্ততা, নতুন উদ্যম ও সাহসিকতা এবং এক নবতর অন্তরবাসনা ও মাদকতা সৃষ্টি করার এ পবিত্র জিহাদে আপনাদেরকেই নিতে হবে অগ্রণী ভূমিকা। এ ঝিমিয়ে পড়া জাতিকে, পতনোন্মুখ উম্মাহকে আপনাদেরই দিতে হবে নতুন জীবনের সন্ধান এবং নতুন মন্‌যিলের ইশারা। এদের টলায়মান পদক্ষেপে আনতে হবে সুদৃঢ় মাত্রার নতুন শক্তি, হিম্মত; দোদুল্যমান চিত্তে বুলাতে হবে আস্থা ও নির্ভরতার জীয়ন কাঠির স্নিগ্ধ পরশ। আপনাদের দায়িত্ব শুধু আপনাদের নিজেদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। সংখ্যার বিচারে উপমহাদেশের মুসলমানগণ গোটা ইসলামী বিশ্বের বৃহত্তম জাতি। চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির জগতে ইসলামী বিশ্বের নির্ভুল পথ-নির্দেশনায় আপনারা এগিয়ে আসুন। ইসলাম ও ইসলামী জীবন বিধানের প্রতি উম্মাহর আস্থা ফিরিয়ে আনুন। জ্ঞান ও অন্বেষার জগতে আপনাদের দৃপ্ত পদচারণা প্রমাণ করুক যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এ

চরমোৎকর্ষের যুগেও ইসলাম সমান কার্যকর। পাকিস্তান আজ ইসলামী আদর্শ ও জীবন বিধানের পরীক্ষাগার। তাই গোটা বিশ্বের দৃষ্টি আজ পাকিস্তানী উম্মাহ্‌র প্রতি নিবদ্ধ। এখানেই আমি আমার বক্তব্যের সমাপ্তি টানছি। ধৈর্য ও মনোযোগের সাথে আপনারা আমার বক্তব্য শুনেছেন এবং আমাকে মনের ব্যথা প্রকাশের সুযোগ দিয়েছেন সে জন্য আমি মাননীয় ভাইস চ্যানসেলর ও উপস্থিত সুধীমণ্ডলীর আন্তরিক শুকরিয়া আদায় করছি।

ইসলামী বিশ্বে চিন্তানৈতিক দ্বন্দ্ব ঃ কারণ ও প্রতিকার

('আল্লামা ইকবাল ইউনিভার্সিটি' ইসলামাবাদে ১৮ই জুলাই প্রদত্ত ভাষণ। 'ভার্সিটির ছাত্র-শিক্ষকসহ স্থানীয় ও দূর অঞ্চলীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে শরীক ছিলেন। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ও আলিম-দের উপস্থিতিও ছিল উল্লেখযোগ্য।

পরিচিতিমূলক স্বাগত ভাষণ দিয়েছেন ডক্টর মুহাম্মদ সিদ্দীক শিবলী এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও সমাপ্তি ঘোষণার আনুষ্ঠানিকতা আঞ্জাম দিয়েছেন 'ভার্সিটির ভাইস চ্যানসেলর ডক্টর শের যামান)।

হামদ্‌ ও সালাত!

জনাব ভাইস চ্যানসেলর, সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলী ও প্রিয় সুধীবৃন্দ!

যে মহান ব্যক্তির নাম ধারণ করে এ বিশ্ববিদ্যালয় আত্মপ্রকাশ করেছে, সৌভাগ্যবশত তাঁর সাথে, তাঁর আদর্শ ও চিন্তার সাথে আমার আশৈশব হৃদয়ের সম্পর্ক। আর তাই আপনাদের আমন্ত্রণে এখানে আসতে পেরে যে আনন্দ উদ্বেলতা আমি অনুভব করছি তা খুব কম শিক্ষাঙ্গনেই আমার কিসমতে জুটেছে। আমার ইচ্ছা ছিল পারস্য কবির এই কবিতা পংক্তি দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করব।

"শোন ভাই! এ পরদেশীরও কিছু বলার আছে।"

কিন্তু ইকবালের সাথে আমার আশৈশব আত্মীয়তার দাবীতে এ বিশ্ববিদ্যা-লয়ের বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে যথার্থই আমি বলতে পারি ঃ

বিস্তৃত পুষ্পোদ্যানের যেখানেই থাকি না কেন
আমারও দাবী আছে তার সৌরভে, তার
বসন্ত জাগ্রত অপরূপ সৌন্দর্যে।

এ বিশ্ববিদ্যালয় ইকবালের পুষ্পোদ্যান হলে আমি সে উদ্যানের বুলবুল। এর যে কোন গাছে, যে কোন শাখায় গান গাওয়ার আমার অধিকার আছে। এ শহরে আমি পরদেশী নই, নই এ উদ্যানে কোন অতিথি পাখী, আমাকে মনে করুন আপনাদেরই এক সাথী বুলবুল।

সুধীবৃন্দ!

আমার হাতে সময় সংক্ষিপ্ত এবং শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে ইকবাল যা কিছু লিখেছেন তা আপনাদের সামনেই রয়েছে। সুতরাং ইকবালের শিক্ষা দর্শন সম্পর্কে আমি মনে করি, নতুন করে আলোকপাত করার প্রয়োজন নেই। আমি শুধু ইকবাল ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করব, ইকবালের শিক্ষাদর্শনকে এখানে আপনরা একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে পাঠ্য-সূচীর অন্তর্ভুক্ত করুন। শিক্ষা সম্পর্কে ইকবালের দৃষ্টিভংগী, সমালোচনা ও মতামতের উপর যদিও একাধিক স্বতন্ত্র গ্রন্থ ও মূল্যবান রচনা-কর্ম রয়েছে, তবু আমার মতে একে স্বতন্ত্র বিষয়ের মর্যাদা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাব-ধানে বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা পরিচালিত হওয়া উচিত। ইকবাল সেই স্বল্প সংখ্যক ভাগ্যবানদের অন্যতম, যারা খোদ ইকবালের ভাষায় ঃ আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার নমরুদী আগুনে বসেও ইবরাহীমী স্বভাব নিয়ে নিরাপদে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি গর্বের সাথে বলতেন ঃ শিকারীর পাতা জালে আমি প্রবেশ করেছিলাম ঠিকই, তবে ফাঁদে আটকা পড়িনি, শিকারীর সন্ধানী চোখের সতর্ক দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে দানা মুখে করে বেরিয়ে এসেছি।

প্রাচ্যের উচ্চাভিলাষী তরুণ শিক্ষার্থীরা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, বিশেষত ইংলণ্ডে উচ্চশিক্ষা লাভের আশায় গমন করত। যে স্বল্প সংখ্যক ভাগ্যবানের কপালে ইউরোপ সফরের দুর্লভ সুযোগ জুটত তারা হতো গোটা দেশের ঈর্ষার পাত্র। তাদের নিজেদেরও তখন গর্বে মাটিতে পা রাখার ফুরসত হতো না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায় ছিল আমার বিচার অনুভূতি জাগ্রত হওয়ার বয়স। খিলাফত আন্দোলনের উত্থান-পতন খুব নিকট থেকেই আমি দেখার সুযোগ পেয়েছি। এক হিসেবে এ আন্দালনের আমি সমবয়সী। ভারতবর্ষে তখন ইংরেজ ও ইংরেজী সভ্যতার জয়জয়কার। কোন সচ্ছল ও অভিজাত পরিবারের জন্য সবচেয়ে বড় গর্বের বিষয় ছিল উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে সে পরিবারের কোন সন্তানের ইউরোপ গমন। গোটা জেলায় তখন ধুম পড়ে যেত যে, অমুক জমিদার, কিংবা অমুক খান সাহেবের সাহেবযাদা ইংলণ্ড

সফরে গিয়েছেন। সে যুগের মিসর, সিরিয়ার তরুণ শিক্ষার্থীদের তুলনায় ভারতবর্ষীয় তরুণদের মধ্যেই ইউরোপের মোহ অধিক মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। অবিভক্ত ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাগুলোই ইংলণ্ড পাড়ি জমিয়েছে এবং অক্সফোর্ড-কেমব্রীজে শিক্ষা লাভ করেছে। তবে ভারতবর্ষের মুসলমানগণ গর্বের সাথে এমন দু'জন ব্যক্তি'র নাম নিতে পারে, যারা ইউরোপের ধর্মহীন ও নৈতিকতা বিধ্বংসী পরিবেশের বিষপ্রভাব থেকে নিজেদের শুধু রক্ষাই করেন নি, সেই সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে বুকে বিদ্রোহের আগুন নিয়ে ফিরে এসেছেন। সেই দুই সৌভাগ্য শিজরার একজন হলেন আল্লামা ইকবাল, আরেকজন ইংরেজ খেদাও আন্দোলনের অগ্নিপুরুষ মাওলানা মুহাম্মদ আলী। মিসর তথা গোটা মধ্যপ্রাচ্য তার সুদীর্ঘ ইতিহাসে এ সৌভাগ্য কখনো অর্জন করতে পারেনি। এমন একজন তরুণ শিক্ষার্থীর নামও সেখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে ইকবালের মত ইউরোপীয় সভ্যতার অভিশপ্ত পরিবেশ থেকে নিজের স্বকীয় সত্তা বজায় রেখে, স্বকীয়তার কণ্ঠস্বর হয়ে স্বদেশ ভূমিতে ফিরে এসেছেন, ফিরে এসেছেন মাওলানা মুহাম্মদ আলীর মত পশ্চিমা সভ্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জ্বলন্ত অংগার বুকে নিয়ে, ইসলামী সভ্যতা ও আদর্শের প্রতি আরো গভীর অনুরাগ ও প্রেম নিয়ে। এটা শুধু এই উপমহাদেশের মুসলমানদের একক গর্ব। অন্তত এ দুটি নামকে চ্যালেঞ্জ করা সম্ভব নয়, নইলে আরো অনেক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি'র নাম এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যারা ইউরোপে গিয়ে নিজেদের স্বকীয় সত্তার সওদা করে ফিরে আসেন নি। প্রকৃত অবস্থার 'ইল্‌ম তো শুধু আল্লাহ্‌রই রয়েছে। আমরা যখন ইকবালের কাব্য পড়ি, কমরেড ও হামদর্দে প্রকাশিত মাওলানা মুহাম্মদ আলীর অনলবর্ষী লেখা পড়ি, স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর নির্ভীক ভূমিকা এবং খিলাফত আন্দোলনের বিপদসংকুল পথে তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ইতিহাস পড়ি, তখন একথা আমাদের স্বীকার করতেই হয় যে, চিন্তার জগতে পশ্চিমা সভ্যতার বিরুদ্ধে ইকবালের চেয়ে বড় বিদ্রোহী এবং পশ্চিমা রাজনীতি ও রাষ্ট্রদর্শনের বিরুদ্ধে মুহাম্মদ আলীর চেয়ে বড় বিদ্রোহী প্রাচ্যের কোন ইসলামী দেশে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই এ গর্ব শুধু ইকবালকেই শোভা পায়।

> সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য গর্বে গর্বিত ফিরিংগী প্রতিমার
> সঙ্গ আমি লাভ করেছি। এর চেয়ে অভিশপ্ত
> মুহূর্ত আমার জীবনে কখনো এসেছে বলে মনে পড়ে না।

মোটকথা, পশ্চিমা সভ্যতার ইন্দ্রজালে বন্দী হয়ে তিনি তাঁর স্বকীয় সত্তা বিসর্জন দেন নি; বরং স্বকীয়তার উদাত্ত কণ্ঠ হয়ে স্বদেশভূমে ফিরে এসেছেন। পাশ্চাত্য সমাজ সভ্যতার গভীরে প্রবেশ করে তিনি তার ত্রুটি ও দুর্বলতা প্রত্যক্ষ করেছেন। আলোঝলমল পর্দার পেছনে দেখেছেন অন্ধকার জগত। সেই মহান ব্যক্তি'র নামে প্রতিষ্ঠিত আপনাদের এ বিশ্ববিদ্যালয়; সুতরাং তার গর্ব যেমন অনেক, দায়িত্বও বিরাট।

সময়ের এই স্বল্প পরিসরে আপনাদের খিদমতে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পেশ করতে চাই। আমাদের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিন্তাশীল ব্যক্তি-বর্গ এবং শিক্ষানীতি প্রণয়নকারী দায়িত্বশীল ব্যক্তিদেরও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আজ এ বিষয়টি ভেবে দেখতে হবে। দু'তিন বছর আগের কথা। আমি বৈরুতে গিয়েছিলাম। আমার এক প্রজ্ঞাবান বুদ্ধিজীবী বন্ধুর নিজস্ব গাড়ীতে করে আমরা বৈরুত শহর ঘুরে দেখছিলাম। তিনি নিজেই গাড়ী ড্রাইভ করছিলেন, আমি ছিলাম তার পাশে। হঠাৎ তিনি আমাকে বললেন: মাওলানা! আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করব। চিন্তা, বুদ্ধিবৃত্তি ও রাজ-নীতির ক্ষেত্রে ইসলামী দেশগুলোতে যে ধরনের দ্বন্দ্ব, নৈরাজ্য ও অস্থিরতা দৃষ্টিগোচর হয় তা অনৈসলামী দেশগুলোতে দেখা যায় না কেন? ভারত, জাপান কিংবা ইউরোপ আমেরিকায় তেমনটি দেখা যায় না কেন? অথচ যে কোন ইসলামী দেশের দিকে তাকালেই দেখা যাবে—সরকার-জনতা দুই বিপক্ষ শিবিরে বিভক্ত। জনতায় জনতায় সংঘর্ষ। ফলে একের পর এক সেখানে অভ্যুত্থান ঘটতে দেখা যায়। বারবার সরকার পরিবর্তন হয়। নেতা ও শাসকদের প্রতি নেই জনগণের আস্থা। শাসক শ্রেণীও জনগণ সম্পর্কে নয় আশ্বস্ত।

সত্য কথা এই যে, বন্ধুর এ প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক জওয়াব আমি দিতে পারিনি। বিভিন্ন কথায় তাকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করেছি মাত্র। কিন্তু প্রশ্নটি আমাকে সত্যি সত্যি ভাবিয়ে তুলল। এর আগে সম্ভবত আমার মনে এ প্রশ্ন উদয় হয়নি। কেন এমনটা হয়, ইসলামী বিশ্বের সমাজ পরিবেশে বিদ্যমান এ অস্থিরতার পেছনে কি কারণ সক্রিয়? এ আদর্শিক দ্বন্দ্ব এবং নীতি ও নৈতিক দর্শনের এ সংঘাতের উৎস কোথায়? এ সম্পর্কে বিস্তর চিন্তা-ভাবনার পর আমি যে জওয়াব পেয়েছি তাই আপনাদের খিদমতে পেশ করছি। কেননা এ গুরুতর সমস্যার আশু সমাধানকল্পে

চিন্তা-ভাবনা ও মত বিনিময়ের মাধ্যমে সমন্বিত কর্মপন্থা নির্ধারণ আমার, আপনার এবং আমাদের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের অবশ্য কর্তব্য।

বাস্তব ঘটনা এই যে, পাশ্চাত্য থেকে যে শিক্ষা দর্শন অমুসলিম দেশ-গুলোতে অনুপ্রবেশ করেছে তা সে অঞ্চলের মৌলিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সাথে সংঘর্ষশীল ছিলনা। প্রথমত, তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক মূল্যবোধ ছিল প্রাণহীন ও আনুষ্ঠানিকতা সর্বস্ব। দ্বিতীয়ত, বাইরে থেকে আগত যে কোন দর্শন ও মতবাদের সাথে সমঝোতা করে নেওয়ার এমনকি তাতে বিলীন হয়ে যাওয়ারও অবাধ সুযোগ সেখানে ছিল বিদ্যমান। মোট-কথা, এসব বিশ্বাস ও মূল্যবোধ কোন মযবুত বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। উদাহরণস্বরূপ আমি আপনাদের জওয়াহের লাল নেহরুর কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ একজন হিন্দুর পরিচয় কি ? অনেক ভেবে-চিন্তে তিনি বললেন, "নিজেকে যে হিন্দু বলে পরিচয় দেয় সেই হিন্দু।" জনৈক বন্ধু আমাকে আরো মজাদার এক ঘটনা শুনিয়েছেন। তিনি শিক্ষা বিভাগে কর্মরত ছিলেন। কলেজের স্টাফ রূমে তারা কয়েক বন্ধু বসে গল্প করছিলেন। কথা প্রসঙ্গে সহকর্মী এক হিন্দু প্রফেসরকে তিনি বললেন ঃ প্রফেসর সাহেব! কেউ যদি আমাদেরকে সংক্ষেপে দু' কথায় ইসলামের পরিচয় দিতে বলে তবে আমরা বলব ঃ সংক্ষেপে ইসলামের পরিচয় হলো, 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' তথা "আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর প্রেরিত রসূল"—এ কথার বিশ্বাস। তদ্রূপ আপনাদের কাছে সংক্ষেপে হিন্দু ধর্মের পরিচয় জানতে চাওয়া হলে আপনারা কি জওয়াব দেবেন ? দেখুন, কোন গভীর দর্শন কিংবা জটিল তত্ত্ব বয়ান করার দরকার নেই। এ সম্পর্কিত প্রচুর গ্রন্থ আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে, আমি পড়ে দেখব। আপনি শুধু বলুন, আমাকেই যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে "হিন্দু কাকে বলে, হিন্দু ধর্মের পরিচয় কি?" তাহলে আমি তাকে কি জওয়াব দেব। বেশ চিন্তা-মগ্নতার পর তিনি বললেন, "মিঃ কিদওয়াই! আসল কথা হচ্ছে, যিনি কোন কিছুতে বিশ্বাস করেন না তিনিও হিন্দু, আবার যিনি সব কিছুতেই বিশ্বাস করেন তিনিও হিন্দু।" মোটকথা, তাদের স্বতন্ত্র 'আকীদা ও বিশ্বাসমালা থাকলেও তা এতটা উদার যে, যে কোন দর্শন ও মতবাদের সাথেই তার সমঝোতা ও আপোষ হতে পারে, নির্ঝঞ্ঝাট সহবাস ও মিলন হতে পারে। এজন্যই

ভারতের হিন্দু সমাজে যখন পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন শুরু হলো তখন তা হিন্দু সমাজে কোন রকম দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি করেনি কিংবা সামাজিক অশান্তি ও অস্থিরতারও কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি। গুটিকতক রক্ষণশীল লোক ছিল, যারা বিশ্বাস করত যে, সমুদ্র ভ্রমণ কিংবা প্রাতস্নান ব্যতিরেকে খাদ্য গ্রহণ শাস্ত্রসম্মত নয়। কিন্তু জীবন যুদ্ধের বিস্তৃত ক্ষেত্রে এগুলোর মূল্য কতটুকু। তাই খুব অল্প দিনেই হিন্দু সমাজের কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, এসব 'আকীদা-বিশ্বাস ও মূল্যবোধ আধুনিক সমাজ সংস্কৃতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম নয়। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল আমাদের মুসলিম সমাজে। এখানে তওহীদের সুনির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে, রয়েছে ঈমান ও কুফরের মাঝে সুস্পষ্ট সীমারেখা। এখানে একই সাথে একাধিক মতা-দর্শের প্রতি বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য প্রদর্শন সম্ভব নয়, সম্ভব নয় একই সাথে নিজেকে তওহীদবাদী ও মুশরিকরূপে পরিচয় দেওয়া। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বিশ্বমানবতার জন্য আল্লাহ্ প্রেরিত চিরন্তন পথপ্রদর্শকরূপে স্বীকার করে নেওয়ার পর জীবনের কোন ক্ষেত্রে মানব চিন্তাপ্রসূত কোন আদর্শ ও মতবাদ গ্রহণের আর অবকাশ থাকেনা। মোটকথা, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মাঝে সমঝোতা ও আপোষের কথা কল্পনা করা সম্ভব নয় মুহূর্তের জন্যও। সুতরাং সেসব দেশে সামাজিক অস্থিরতা দেখা দেওয়ার কথা নয় যেখানে 'আকীদা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ধর্মের ইতিবাচক ও সুনির্দিষ্ট কোন ব্যবস্থা ও বিধি-বিধান নেই, নেই সুদৃঢ় অবস্থান। পক্ষান্তরে হিদায়াত ও গোমরাহীর মাঝে চির পার্থক্য রেখা টেনে দিয়ে আল-কুরআন ঘোষণা করেছে ঃ

وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ـ

সত্যের (প্রত্যাখ্যানের) পর গোমরাহী ছাড়া আর কি থাকে ? সুতরাং তোমরা কোথায় যাচ্ছ ?

ইসলাম বিশ্বাস করে যে, হিদায়াত বা নূর একটি একক অস্তিত্ব। পক্ষান্তরে গোমরাহী বা অন্ধকার অসংখ্য। আপনি আল-কুরআন আদ্য-পান্ত পড়ে দেখুন, কোথাও নূরের বহুবচন ব্যবহার করা হয়নি। আরবীতে কি নূর শব্দের বহুবচন নেই। যে কোন সাধারণ ছাত্রও বলে দিতে পারে

যে. নূরের বহুবচন হচ্ছে 'আনওয়ার'। আপনাদের দেশেও নিশ্চয়ই আনওয়ার নামে অনেক লোক রয়েছে, এ মজলিসেও হয়ত দুচারজন 'আনওয়ার' খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। মোটকথা, নূরের বহুবচন শুধু বিদ্যমানই নয়, উচ্চাংগ সাহিত্যেও তার বহুল বিশুদ্ধ ব্যবহার রয়েছে। তা সত্ত্বেও আল-কুরআনে আলো ও হিদায়াতের ক্ষেত্রে একবচন এবং অন্ধকার ও গোমরাহীর ক্ষেত্রে বহুবচন ظلمات ব্যবহার করেছে। কেননা আল-কুরআনের দৃষ্টিতে আলো ও হিদায়াত একটি একক অস্তিত্ব। পক্ষান্তরে অন্ধকার ও গোমরাহী আসতে পারে হাজারো রূপ ধরে।

وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ -

আল্লাহ্ যাকে নূর দান করেন নি তার নূর লাভের কোন উপায় নেই।

এমন যে ধর্মের রূপ, স্বভাব ও প্রকৃতি, সে ধর্মের দ্ব্যর্থহীন ও বলিষ্ঠ ঘোষণা এই যে, ইসলামই আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র ধর্ম ও জীবন বিধান। নিছক আকীদা ও বিশ্বাস এবং অনুষ্ঠান ও বাহ্যিকতা নিয়েই যে ধর্ম সন্তুষ্ট নয়, যে ধর্মের রয়েছে স্বতন্ত্র তাহযীব-তমদ্দুন, রয়েছে পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা, সেই সমাজে সেই উম্মাহর জীবনে পাশ্চাত্য যখন তার সামগ্রিক রূপ ও প্রকৃতি নিয়ে, পরিপূর্ণ জীবনবোধ ও দর্শন নিয়ে অনুপ্রবেশ করল, তখন এক অনিবার্য পরিণতি হিসেবেই দুই আদর্শের মাঝে দেখা দিল দ্বন্দ্ব-সংঘাত। শুরু হলো অস্তিত্বের জীবন-মরণ লড়াই। সেই সাথে ইসলামী বিশ্বের দুর্ভাগ্য এই যে, একদিকে অভিজাত ও সচ্ছল শ্রেণীর মেধাবী ও প্রতিভাধর তরুণরা মনেপ্রাণে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করে নিল এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণে মেতে উঠল। অন্যদিকে দেশের গরিষ্ঠ অংশ তথা সাধারণ জনতা নিজেদের ঈমান ঐতিহ্য এবং 'আকীদা-বিশ্বাস আরো মযবুতভাবে আঁকড়ে ধরল। ফলশ্রুতিতে দেশের শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী সাধারণ মানুষের আকীদা-বিশ্বাস এবং চিন্তা-উপলব্ধি ও অনুভূতি থেকে বহু দূরে সরে পড়ল। এভাবে একই দেশে যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন ও নতুন দুটি জাতির জন্ম হলো। তদুপরি অভিজ্ঞতার আলোকে আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণী এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে এবং ক্ষমতা ও নেতৃত্বের পথ নিষ্কণ্টক রাখতে

হলে যে কোন মূল্যে জনসাধারণের ধর্মীয় অনুভূতিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে এবং 'আকীদা ও বিশ্বাসের বুনিয়াদ কমযোর করে দিতে হবে যাতে তারা তাদের উচ্চাকাঙ্খার পথে কখনো প্রতিবন্ধক না হতে পারে। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখেই আধুনিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণী শিক্ষার মাধ্যমে প্রচার ও সাংবাদিকতার মাধ্যমে এমন কি কাব্য সাহিত্য ও শিল্পকলার মাধ্যমে নেমে পড়ে জনসাধারণের ধর্মীয় অনুভূতি এবং ইসলাম প্রেম খতম করার এক মহা অভিযানে। এভাবে গোটা ইসলামী উম্মাহ বিভক্ত হয়ে পড়ে বিবদমান দুই শিবিরে। আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণী ও বুদ্ধিজীবী সমাজের মনে এ আশংকা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, জনসাধারণের এ ধর্মীয় অনুভূতি ও ইসলাম প্রীতি অব্যাহত থাকলে যে কোন সময় এরা আমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ বিক্ষোভে ফেটে পড়তে পারে। সুতরাং নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থেই তা সমূলে বিনষ্ট করে দিতে হবে। এ সব আমি আপনাদেরকে মিসরের কাহিনী বলছি, সিরিয়ার কাহিনী বলছি, বলছি ইরাক-তুরস্কের কাহিনী। আমি একথা বলতে চাই না যে, এটা সব দেশেরই কাহিনী। আল্লাহ্ করুন, এদেশের মাটিতে যেন এ মর্মান্তিক নাটক কখনো মঞ্চস্থ না হয়। কিন্তু উন্নত মুসলিম দেশগুলোতে এ নাটকই মঞ্চস্থ হয়েছে। এমন একটি শ্রেণীর সেখানে উদ্ভব হয়েছে ইসলামের সাথে যাদের সম্পর্ক অপরিচয়ের সীমা অতিক্রম করে দূরত্ব ও অস্বস্তির পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। অন্যদিকে জনসাধারণের ধর্মীয় অনুভূতি সংকুচিত হতে হতে আজ মৃতপ্রায়। ফলে ধর্মভীরুদের মনেও আজ সমাজে বিদ্যমান পাপাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মনোভাব নেই, নেই কিঞ্চিত ঘৃণা পর্যন্ত। তাদের ভাবটা যেন এই ঃ আরে ভাই! কিছু লোক মদ খেলে, আমোদ-প্রমোদে মত্ত হলে তাতে এমন কি ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় ; টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রের পর্দায় অশ্লীল ছায়াছবি প্রদর্শিত হলেই বা এমন কি কিয়ামত ঘটে যায়, যুবক-যুবতীদের চরিত্রে ও নৈতিকতায় ধ্বস নামলেই বা আমাদের কি করণীয় থাকতে পারে? মোটকথা, তারা নিজেকে নিয়েই যেন সন্তুষ্ট। মুসলিম সমাজেরও আজ এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, ধর্ম মানব জীবনের ব্যক্তিগত ব্যাপার। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণকারী মুসলিম তরুণদের মন-মগজে একথা বদ্ধমূল করে দিয়েছে যে, ধর্ম মানুষের নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার, ব্যক্তি জীবনের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকার মধ্যেই ধর্মের কল্যাণ নিহিত। এই নতুন ধ্যান-ধারণা ও মন-মগজ সাথে করে দেশে ফিরে এসে দেখতে পায় যে, সমাজের

বৃহত্তর জনগোষ্ঠী তাদের এ সবক কিছুতেই মানতে রাযী নয়। সরকারের গৃহীত সকল পদক্ষেপেই এরা হস্তক্ষেপ করে সমালোচনামুখর হয়ে ওঠে, অসন্তোষ ও বিক্ষোভে ফেটে পড়ে, ক্ষমতাসীন শ্রেণী তখন খোদ জনতার বিরুদ্ধেই যুদ্ধে নেমে পড়ে। জনতার ইসলামী জাগরণ রোধ করাই তখন হয়ে পড়ে তার মুখ্য কাজ। জামাল আবদুন নাসেরের আমলে গোটা প্রশাসন ও সরকারী শক্তি নিয়োজিত হয়েছিল মিসরের জনসাধারণের বিরুদ্ধে। মিসরের যাবতীয় সম্পদ উপকরণ, গোটা জাতির যোগ্যতা ও প্রতিভা এবং ক্ষমতাসীন দলের সময়, শ্রম ও মেধা ব্যয় হচ্ছিল মিসরবাসীর হৃদয় থেকে ধর্মীয় অনুভূতি তথা ইসলাম প্রীতি নির্মূল করার কাজে। কেননা ক্ষমতা-সীনদের মনে পুরো মাত্রায় এ আশংকা বিদ্যমান ছিল যে, সামান্যতম শিথি-লতার ফাঁকে যে কোন মুহূর্তে এ ইসলামী জাগরণ রূপ নিতে পারে লাভা উদ্‌গীরণকারী আগ্নেয়গিরির। ইসরাইলের বিরুদ্ধে জিহাদ কিংবা কমু-নিজম আন্দোলন প্রতিরোধের পরিবর্তে প্রেসিডেন্ট নাসেরের গোটা শাসন যুগ কেটেছে নিরীহ শান্তিপ্রিয় মিসরী জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত দমন অভিযানে এবং মিসরের মাটি থেকে ইসলামী আন্দোলন ও আন্দোলন-কর্মীদের উৎখাতের ঘৃণ্য প্রচেষ্টায়। এর ফলাফল কি দাঁড়িয়েছে এবং নাসের ও তার অনুসারীরা কতটা সফলকাম হয়েছে তা অবশ্য ইতিহাসের বিষয়। কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, মিসরের মাটিতে সরকার ও জনতার এ লড়াই সংঘটিত হয়েছে। একই লড়াই চলছে সিরিয়া, ইরাক, লিবিয়া, তিউনিসিয়া, আলজিরিয়া ও মরক্কোসহ মুসলিম বিশ্বের দেশে দেশে। সে লড়াই কোথাও চলছে অসির ভাষায়, কোথাও বা মসির ভাষায়। আরব বিশ্বের বাইরে সুনির্দিষ্ট-ভাবে আমি কোন অনারব দেশের নাম নিতে চাই না। বিপরীতধর্মী দুই মতাদর্শ এবং বিপরীতমুখী দুই শিক্ষা ব্যবস্থার ফলেই এ কৃত্রিম রণক্ষেত্রের সৃষ্টি। এক দিকে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষা দেওয়া হয় কালাল্লাহ ও কালাররাসূল।[১] অন্যদিকে আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দেওয়া হয় এর সম্পূর্ণ বিপরীত শিক্ষা। অবিভক্ত ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বুনিয়াদ মযবুত করার উদ্দেশ্যে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা যখন প্রবর্তন করা হলো এবং সে শিক্ষার অভিশাপে অত্যল্পকালের মধ্যেই ভারতীয় মুসলিম সমাজে নেমে এলো চরম বিপর্যয় ও প্রলয়ংকরী ধ্বংস, সে সময় কবি আকবর ইলাহাবাদীই বৃটিশ তথা পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে

১ অর্থাৎ কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা।

তার ক্ষুরধার লেখনী পরিচালনা করেছিলেন। তিনি তাঁর এক অমর কবিতায় আধুনিক ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থার স্বরূপ এত সুন্দর ও নিখুঁতভাবে তুলে ধরে-ছেন যা আজ পর্যন্ত অন্য কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি, সম্ভব হয়নি পাশ্চাত্য শিক্ষার কুফল সম্পর্কে এত সহজ সরল ভাষায় এমন গভীর ও বাস্তব সত্য প্রকাশ করা। আকবরের ভাষায়ঃ

یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا
افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی

এভাবে শিশুহত্যার কলংক তাকে বহন করতে হতো না;
বেচারা ফিরআউনের মাথায় কলেজ প্রতিষ্ঠার বুদ্ধি খেলল না।

বেচারা ফিরাউনের মগজ জন্ম দিল না কলেজ প্রতিষ্ঠার ধূর্ত কৌশল, তাহলে তো আর ইতিহাস তার ললাটে এঁকে দিতনা শিশু হত্যার কলংক-তিলক।

সত্যি তাই! ফিরাউনের নির্বুদ্ধিতাই ইতিহাসের পাতায়—এমনকি আসমানী কিতাবের পাতায়ও এক অভিশপ্ত নরপশুরূপে তাকে চিত্রিত করেছে। পাইকারী শিশুহত্যার কলংক গায়ে না মেখে যদি সে নতুন শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করত, দেশের সর্বত্র বিদ্যালয় খুলে দিয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার সরকারী ফরমান জারী করত তাহলে নিন্দার বদলে বন্দনাই জুটত আজ তার কপালে। মূর্খতার পরিবর্তে তাকে আজ মনে করা হতো জ্ঞান ও সংস্কৃতির মহান পৃষ্ঠপোষক। পৃথিবীর দেশে দেশে তার নামে প্রতিষ্ঠিত হতো কতশত ইউনিভার্সিটি, একাডেমী ও গবেষণাগার।

এমনকি ইসলামের পুণ্যভূমি সউদী আরবেও আজ পাশ্চাত্য শিক্ষা-ব্যবস্থার বদৌলতে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেছে। যে দেশ ইসলামের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার এবং বিশ্বের বুকে ইসলামের ঝাণ্ডা সমুন্নত রাখার সংকল্প ঘোষণা করে—সে দেশকে সর্বাগ্রে এ বুদ্ধিবৃত্তিক দ্বন্দ্ব ও সাংস্কৃতিক লড়াই থেকে রক্ষা করতে হবে। কেননা কোন দেশে এ ধরনের দ্বন্দ্ব-লড়াই একবার শুরু হলে জাতির সবটুকু যোগ্যতা, প্রতিভা ও কর্মক্ষমতাই সে চিতার বহ্নিশিখায় ভস্ম হয়ে যায়। যে শক্তি ব্যয় হওয়া উচিত দেশ গঠনে, সমাজ সংস্কারে, জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জনে এবং দেশরক্ষার মহান কাজে, তাই ব্যয় হতে থাকে নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে এবং ধ্বংস তৎপরতায়।

সবার তখন একমাত্র লক্ষ্য— প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করে আমাদের বিজয়, আমাদের জীবন-দর্শন ও নীতিবাদের বিজয় সুনিশ্চিত করতে হবে। আমার একান্ত প্রত্যাশা, এ মহান সংস্কারমূলক বিপ্লবী কার্যক্রমে অন্যান্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অপেক্ষা না করে আপনারাই এগিয়ে আসবেন সবার আগে। কেননা যে মহান ব্যক্তির নামে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা—তাঁর জীবনের শেষ স্বপ্ন ছিল এটাই। প্রচলিত ঔপেনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ছিলেন সোচ্চার। কোন ইসলামী দেশের জন্য এ শিক্ষাব্যবস্থাকে তিনি মনে করতেন বিষতুল্য। তাই বেঁচে থাকলে সম্ভবত সবার আগে তিনিই আজ আওয়াজ তুলতেন এ শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে, সোচ্চার হতেন জাতির 'আকীদা-বিশ্বাস, জীবন দর্শন ও মূল্যবোধের উপযোগী নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবীতে।

জর্দানে একবার একটি যৌথ সাক্ষাতকার নেওয়া হয়েছিল। জর্দানের বর্তমান ওয়াক্ফ্ মন্ত্রী উস্তাদ কামিল শরীফ, বিশিষ্ট সউদী বুদ্ধিজীবী শেখ আহমদ জামাল এবং আমি—আমরা এই তিনজন সাক্ষাতকার গ্রহণকারীর বিভিন্ন প্রশ্নের জওয়াব দিচ্ছিলাম। নিয়মিতভাবে এ সাক্ষাতকার রেডিওতে প্রচারিত হতো। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ আজকের যুব সমাজের প্রধান সমস্যা কি? তাদের এ অস্থিরচিত্ততার উৎস কোথায়? সংক্ষেপে আমার বক্তব্য ছিল এই ঃ জীবনের সর্বত্র বিদ্যমান অসংগতি ও বৈপরীত্যই হচ্ছে এর প্রধান কারণ। ব্যক্তি, পরিবার ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বত্র তারা এ বৈপরীত্যের মুখোমুখি হচ্ছে। ফলে দিন দিন তাদের হৃদয়ে পুঞ্জীভূত হচ্ছে হতাশা ও বিক্ষোভ, আর এ পুঞ্জীভূত হতাশা ও ধূমায়িত বিক্ষোভই তাদের বিদ্রোহী করে তুলছে, পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, নীতিবাদ ও মূল্য-বোধের বিরুদ্ধে। পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য সম্পর্কে তারা যা শুনেছে, জেনেছে, পারিবারিক জীবনের কোথাও তারা তার ছাপ দেখতে পায় না। মা-বাবা কিংবা অভিভাবকদের মুখে তারা শুনতে পায় এক ধরনের জীবন দর্শন ও মূল্যবোধের কথা, কিন্তু শিক্ষাঙ্গণে তাদের পড়ানো হয় ভিন্ন কিছু, সাহিত্য ও শিল্পকলার নামে তাদের পরিবেশন করা হয় অন্য কিছু। বিনোদনের নামে রেডিও টেলিভিশন তাদের হাতছানি দেয় অশ্লীলতার, অবাধ যৌনতার এবং বল্গাহীন ভোগবাদের। এ জীবন বৈপরীত্য তাদের মধ্যে এমন এক কনফি-উশন তথা মানসিক অস্থিরতা জন্ম দিয়েছে যে, পুরোনো মূল্যবোধের প্রতি

আস্থা রেখে জীবন পথের সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এ অস্বস্তিকর অবস্থা যতদিন অব্যাহত থাকবে ততদিন ইসলামী উম্মাহ তার যুবশক্তিকে নৈতিক অবক্ষয় ও মূল্যবোধের ধ্বস থেকে রক্ষা করতে পারবে না কোন উপায়েই। এক গাড়ীতে দু'টি ঘোড়া যুতে দিলে এবং একটি পূর্বমুখী, আরেকটি পশ্চিমমুখী, যে পরিণতি হতে পারে সে ভয়ংকর পরিণতি থেকে ততদিন আমাদের অব্যাহতি নেই। সম্ভব হলে আজ এই মুহূর্তেই আমাদের সমাজ জীবন ও শিক্ষাব্যবস্থা থেকে এ দ্বিমুখী অবস্থার অবসান ঘটানো কর্তব্য।

আপনাদের খিদমতে এই আমার বক্তব্য। মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর ও জাস্টিস আফজল চীমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ ; তাঁরা আমাকে এখানে আসার আমন্ত্রণ করেছেন এবং আমাকে কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন। আমার কথাগুলো হয়ত আপনাদের স্মরণ থাকবে না, কিন্তু 'আল্লামা ইকবালের এ পয়গাম তো অবশ্যই মনে থাকবে।

اے پیر حرم! رسم و رہ خانقہی چھوڑ
مقصود سمجھ میری نوائے سحری کا
اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت
دے انکو سبق خود شکنی و خودنگری کا
تو انکو سکھا خارہ شگافی کے طریقے
مغرب سکھایا انہیں فن شیشہ گری کا
دل توڑ گئی ان کا دو صدیوں کی غلامی
دارو کوئی سوچ ان کی پریشاں نظری کا

হরমের হে পীর! খানকাহ্র প্রাণহীন আনুষ্ঠানিকতা বর্জন কর ; আমার শেষ রাতের আহাজারির মর্ম অনুধাবন কর।

তোমাদের তরুণদের আল্লাহ্ নিরাপদ রাখুন ; তাদের শিখাও আত্মগঠন ও আত্মপীড়নের পাঠ।

পাশ্চাত্য তাদের শিখিয়েছে কাঁচ তৈরীর শিল্প ; তুমি তাদের শিখিয়ে দাও জীবন জয়ের পন্থা।

দু'শ বছরের বন্দীদশা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে তাদের মন ; তোমাকে আজ খুঁজে পেতে হবে তাদের হৃদয়ের এ রক্তক্ষরণের কোন উপশম।

উর্বর ভূমি, প্রতিভা-প্রসবিনী দেশ

(তেইশে জুলাই ১৯৭৮, ফয়সালাবাদ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, 'আলিম ও বুদ্ধিজীবী-দেরও একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যা সভাকক্ষে উপস্থিত ছিলেন। ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নরত আরব ছাত্রদের অনুরোধে একই বিষয়ে আরবীতে তাঁকে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিতে হয়)।

হা'মদ ও সালাত !

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, মাননীয় 'উলামায়ে কিরাম ও আমার প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা !

দেশের মর্যাদার মানদণ্ড

এক বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত আপনাদের এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হতে পেরে এ মুহূর্তে আমি গভীর আনন্দ অনুভব করছি। আমাকে এ মর্যাদায় অভিষিক্ত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আমি আন্তরিক শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

কোন দেশের উন্নতি, অগ্রগতি এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা লাভের মাপকাঠি অধিক সংখ্যায় স্কুল-কলেজ ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা কিংবা কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে সমৃদ্ধি অর্জন নয়, নয় শিল্পপতি ও পুঁজিপতিদের সংখ্যাধিক্য কিংবা জীবন যাত্রার উন্নত মান ; বরং বিশ্বের দরবারে কোন দেশের মর্যাদা লাভের প্রকৃত মাপকাঠি হচ্ছে সে দেশের বিদ্বান ও বুদ্ধিজীবীদের জ্ঞান-পিপাসা, অজানাকে জানার আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা এবং মৌলিক আবিষ্ক্রিয়া ও গবেষণা কর্মে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা। একটি দেশে সবকিছুই

আছে, প্রাকৃতিক সম্পদের অফুরন্ত ভাণ্ডার আছে, আছে সম্পদ ও বিলাস প্রাচুর্য, কিন্তু তাদের মধ্যে জ্ঞান-পিপাসা নেই, অনুসন্ধিৎসা নেই, নেই এমন নিষ্ঠাবান ও নিবেদিতপ্রাণ বিজ্ঞানী, গবেষক, আলিম ও বুদ্ধিজীবী যারা দেশ ও জাতির কল্যাণে উৎসর্গ করে দেবে নিজেদের গোটা জীবন, স্ব-স্ব ক্ষেত্রে দিনরাত যারা নিয়োজিত থাকবে মৌলিক গবেষণা কর্মে, প্রশংসা লাভ ও প্রতিষ্ঠা অর্জন যাদের উদ্দেশ্য নয়, যাদের জীবনের মূল লক্ষ্য হবে দেশ ও জাতির নিঃস্বার্থ সেবার বিনিময়ে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন। সরকারী পুরস্কার ও স্বীকৃতির জন্য যারা কখনো লালায়িত নয়, কর্ম-ক্লান্তির মাঝে যারা খুঁজে পায় জীবনের প্রশান্তি ; পক্ষান্তরে কর্মহীনতা ও অবসর জীবন যাদের জন্য অসহনীয় অভিশাপ, কর্ম যাদের জীবন, কর্ম যাদের প্রাণ।

এখানে এসে আনন্দ পেয়েছি

এখানে এসে এই দেখে আমার আনন্দ হয়েছে যে, এদেশে একটি উন্নত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশেষত আরব বিশ্বের তরুণ শিক্ষার্থীরা অধ্যয়ন ও গবেষণা কর্মে দলে দলে এখানে আসছে। এ জ্ঞান-প্রেম ও বিদ্যোৎসাহ দেখে একজন মুসলমানের এবং একজন বিদ্যার্থীর অবশ্যই আনন্দ হওয়া উচিত। আল্লাহ্‌র শোকর যে, আমি একজন মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে একজন বিদ্যার্থীও। তাই স্বাভাবিক কারণেই এখানে এসে আমি গভীর আনন্দ লাভ করেছি।

দেশ ও জাতির কল্যাণে যোগ্যতা ও প্রতিভা নিয়োজিত করুন

আমি আশা করি, এ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণরা দেশ ও জাতির কল্যাণ নিজেদের নিয়োজিত করবে। আমাদের বড় দুর্ভাগ্য এই যে, দেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাগুলো সুযোগ পেলেই উচ্চতর বেতন ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার মোহে ইউরোপ-আমেরিকায় পাড়ি জমায়। গোটা আমেরিকা ঘুরে ঘুরে আমি দেখে এসেছি আমাদের প্রাচ্য দেশগুলোর যে প্রতিভাধর তরুণেরা স্বদেশকে অনেক কিছু দিতে পারত, যাদের সামান্য প্রচেষ্টায় দেশের মাটিতে সোনার ফসল ফলত, প্রাকৃতিক ও ভূগর্ভস্থ সম্পদ আহরিত হতে পারত, যাদের অবদানে দেশ ও জাতি হতে পারত সমৃদ্ধ ও মর্যাদামণ্ডিত, তারাই আজ স্বার্থপরতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বিদেশকেই নিজেদের কর্মক্ষেত্র ও রংগীন

ভবিষ্যত গড়ার ময়দানরূপে বেছে নিয়েছে। এতে তাদের ব্যক্তিস্বার্থ যতই হাসিল হোক না কেন, দেশ ও জাতি কিন্তু অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়। আমি মনে করি, স্বদেশ ভূমির স্বজাতির সাথে এটা তাদের নির্লজ্জ বিশ্বাস-ঘাতকতা। লেখাপড়া শিখে কাজের উপযুক্ত হয়েই তারা পাড়ি জমায় বিদেশে, নিজেদের জীবনে সম্পদ ও বিলাস প্রাচুর্য নিশ্চিত করা ছাড়া তাদের সামনে আর কোন উদ্দেশ্য থাকে না! তখন এরা যদি আত্মত্যাগের মহান মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের শ্রম ও মেধা জাতির সেবায় নিয়োজিত করত তাহলে খুব অল্প সময়েই প্রাচ্য দেশগুলোর ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূর হতো, জাতীয় জীবনে সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য আসত। কিন্তু আফসোস! আমাদের সম্পদ আজ অন্যদের কাজে আসছে আর জাতীয়ভাবে আমরা দিন দিন দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছি। সুতরাং আমি এদেশের এবং আরব তরুণদের —আশা করি এখানে থেকে তারা আমার কথা বোঝার মত উর্দূ শিখে ফেলেছেন—প্রতি আমার সকাতর অনুরোধ, নিজেদের মেধা, যোগ্যতা, জ্ঞান, অধ্যবসায় ও গবেষণা কর্ম আপনারা স্বদেশ ও স্বজাতির সেবায় নিয়োজিত করুন। স্বদেশ ও স্বজাতিই আপনাদের কর্ম জীবনের অবদানের প্রকৃত হকদার। এটা খুবই দুঃখজনক এবং দেশপ্রেম ও ইসলামী অনুভূতিরও বিরোধী যে, আমাদের মেধা ও যোগ্যতা তাদের সেবায় নিয়োজিত হবে যারা গোটা ইসলামী বিশ্বকে গোলাম বানিয়ে রেখেছে। গোটা মুসলিম দুনিয়া আজ প্রত্যক্ষভাবে কিংবা পরোক্ষভাবে রাজনীতি, অর্থনীতি, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে আমেরিকা ও রাশিয়ার পদানত, উন্নত বিশ্বের অধীনস্থ। আমাদের প্রতিভাবান তরুণরা যদি স্বদেশ ও স্বজাতির সেবায় নিজেদের মেধা, শ্রম ও যোগ্যতা ব্যয় করত তবে দেশ ও জাতি যেমন তাদের অবদানে সমৃদ্ধ হতো, তেমনি তারাও ধন্য হতে পারত আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভে।

দর্শন, মতবাদ, জ্ঞান অন্বেষা ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে প্রাধান্য

যে সব দেশ আজ দার্শনিক মতবাদ, বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া ও জ্ঞান অন্বেষার নামে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস, ও তাহযীব-তমদ্দুনের বিরুদ্ধে জঘন্য হামলা চালাচ্ছে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইসলামী উম্মাহর উদ্যমী তরুণরা আজ নবতর দর্শন ও জ্ঞান অন্বেষার মাধ্যমে সেগুলোর দাঁতভাঙগা জওয়াব দিতে এগিয়ে আসবে। ভৌগোলিকভাবে কোন দেশকে গোলাম বানিয়ে রাখার দিন এখন ফুরিয়ে গেছে। এটা অবধারিত যে, কোন দেশের কোন উচ্চাভিলাষী

একনায়কের মাথায় তেমন পাগলামী খেয়াল চেপে থাকলে সময়ের প্রচণ্ড চপেটাঘাতে মুখ থুবড়ে পড়তে হবে তাকে। কিন্তু দার্শনিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক মতবাদ এবং সত্য সন্ধান ও জ্ঞান অন্বেষার ছদ্মাবরণে ইসলামের উপর সূক্ষ্ম কুটিল হামলা সব সময় চলে এসেছে, আজো চলছে এবং ভবিষ্যতেও তা চলতে থাকবে। এক সময় গ্রীকদর্শনের হামলা এসেছিল এবং তা ইসলামী 'আকীদা-বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। সে সময় ইসলামের হিফাজত ও খিদমতের জন্য উম্মাহ জন্ম দিয়েছিল ইমাম গাযালী, ইমাম বাকিল্লানী, ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ্ এবং ইমাম রাযীর ন্যায় কালজয়ী প্রতিভার। আধুনিক উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের গোড়াপত্তন হওয়ার পর পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা ইতিহাসের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে নতুন হামলা শুরু করলেন। তাঁরা বলে বেড়াতে লাগলেন যে, হযরত ওমরের নির্দেশে মুসলমানরাই ইসকান্দারিয়া গ্রন্থাগার ধ্বংস করেছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের একযোগে পরিচালিত প্রচারণার ধূম্রজালে এ নির্জলা মিথ্যাও এমন অখণ্ডনীয় সত্যে পরিণত হয়েছিল যে, যে কোন শিক্ষিত লোকই এ অপবাদের সামনে মাথা নত করে ফেলত। কেননা তাদের ভয় ছিল, এমন একটা ঐতিহাসিক সত্য মেনে নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলে শিক্ষিত ও সুধীজনদের মজলিসে হাস্যাস্পদে পরিণত হতে হবে। বিভিন্ন পালা-পার্বণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ রসিয়ে রসিয়ে বলে বেড়াতেন যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা দূরের কথা, মুসলিম জাতি তো এমনই জ্ঞান-বিদ্বেষী যে, তাদের দ্বিতীয় খলীফা ওমর ইস্‌কান্দারিয়ার বিশাল গ্রন্থাগার জ্বালিয়ে ভস্ম করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এ গ্রন্থগুলো কুরআন-সুন্নাহ মুতাবিক হলে তার কোন প্রয়োজন নেই; পক্ষান্তরে কুরআন-সুন্নাহ্র বিরোধী হলে তা ভস্ম হয়ে যাওয়াই শ্রেয়। ইউরোপের খৃস্টান ঐতিহাসিকদের লেখনী এ নির্জলা মিথ্যা প্রসব করেছে আর আমাদের সরলমনা শিক্ষিত তরুণরা তা এক ঐতিহাসিক সত্যরূপে নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছে। উপমহাদেশের স্বনামধন্য ঐতিহাসিক সমালোচক মাওলানা শিবলী নোমানী সর্বপ্রথম এ বিষয়ে কলম ধরেন এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যের আলোকে গাণিতিক সত্যের মত একথা প্রমাণ করেন যে, হযরত ওমরের খিলাফত লাভ এবং মুসলিম বাহিনীর মিসরে প্রবেশের অনেক আগেই ইসকান্দারিয়ার গ্রন্থাগার জ্বলে গিয়েছিল এবং তা ছিল গোড়া খৃস্টান পাদ্রীদের কর্ম। আধুনিক খৃস্টান পণ্ডিতগণ নিজেদের সে দোষ আজ নন্দঘোষের ঘাড়ে চাপানোর অপপ্রয়াস চালাচ্ছেন মাত্র।

আর গ্যালিলিওর মত জ্ঞান-তাপসকে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারার কথা যারা ভাবতে পারে তাদের পক্ষে সামান্য একটা গ্রন্থাগার জ্বালিয়ে দেওয়া এমন দোষের কি! তবে সে দায়িত্ব এমন এক উম্মাহর ঘাড়ে চাপানো দোষের বৈকি যাদের প্রথম ঐশী বাণী হলো, اقرأ পড়। অনুরূপভাবে যখন ঐতিহাসিকভাবে একথা প্রমাণ করার অপপ্রয়াস চালানো হলো যে, মহান আওরংগযীব ছিলেন স্বেচ্ছাচারী, হিন্দু নিপীড়নকারী সম্রাট; তখনও মাওলানা শিবলী নোমানীর ক্ষুরধার লেখনীই এসব অপপ্রচারের দাঁতভাঙা ঐতিহাসিক জওয়াব দিয়েছেন।

বিজ্ঞানের কোন যাত্রা বিরতি নেই

একইভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে যখন রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ-নীতির ছত্রছায়ায় হামলা শুরু হলো তখন উপমহাদেশের মুসলিম চিন্তানায়ক ও বুদ্ধিজীবিগণ তার সফল মুকাবিলা করলেন। বিভিন্ন দর্শন, মতবাদ ও উপস্থাপিত তথ্যের জ্ঞান-নির্ভর চুলচেরা বিশ্লেষণ করে সেগুলোর অসারতা প্রমাণ করলেন। তাঁরা আরো প্রমাণ করলেন যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান হচ্ছে এক চিরঅভিযাত্রী, তার কোন যাত্রা-বিরতি নেই। প্রতিটি আগামী দিন তার জন্য নিয়ে আসছে নতুন তথ্য, নতুন সত্য। সুতরাং কোন বিষয়েই চট করে শেষ কথা বলে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে বিজ্ঞানের গতি-প্রকৃতি ও অবস্থান সম্পর্কে অজ্ঞতা।

আমি মনে করি, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নত মুসলিম তরুণদের দায়িত্ব হচ্ছে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের মাধ্যমে যে সব ভ্রান্ত মতবাদ পরিবেশিত হচ্ছে এবং কুরআনী শিক্ষা ও বিশ্বাসকে ভুলপ্রমাণ করার যে অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে সেগুলোর সফল মুকাবিলায় এগিয়ে আসা। এখানে থেকে এভাবেই আপনারা দীনের বিরাট খিদমত আঞ্জাম দিতে পারেন। যেমন ধরুনঃ কুরআন বলছে---"প্রত্যেক বস্তুকে আমি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি।" উদ্ভিদ জগতেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি, আল-কুরআনের পূর্বে পৃথিবীর কোথাও এ ঘোষণা উচ্চারিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এখন আপনারা নিজেদের অধ্যাবসায়, গবেষণা ও অন্বেষা নিয়ে এগিয়ে আসুন এবং এ কুরআনী ঘোষণার সত্যতা প্রমাণ করুন। বিশ্বকে আজ আপনাদের বোঝাতে হবে যে, আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর আগে হিজাযের মরুঅঞ্চলে উদ্ভিদ বিজ্ঞান সম্পর্কিত

এ বিপ্লবী ঘোষণা উম্মী নবীর এক জীবন্ত মু'জিযা ছাড়া আর কিছু নয়, বিশেষ করে উদ্ভিদ বিজ্ঞান সম্পর্কে তো সূরাতু'র-রা'দে এমন কতগুলো তথ্য ও তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে যেগুলোর উপর স্বতন্ত্র গবেষণা পরিচালিত হতে পারে এবং আমি মনে করি, আপনাদের এ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, আলোচ্য ক্ষেত্রে এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে, পারে বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারের জগতে গোটা বিশ্বের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা কুড়াতে।

এ দায়িত্ব ছিল ইসলামী বিশ্বের

একথা আজ কারো অজানা নেই যে, ডারউইনের বিবর্তনবাদ এক সময় শুধু বিজ্ঞানের জগতেই নয় বরং 'আকীদা-বিশ্বাস ও মূল্যবোধের জগতেও প্রলয়ংকরী ঝড় তুলেছিল। এ ঝড়ের গতি রোধ করা এবং বৈজ্ঞানিক পন্থায় এর অসারতা প্রমাণ করার দায়িত্ব ছিল ইসলামী দুনিয়ার নামী-দামী গবেষক চিন্তাবিদদের। সৌভাগ্যক্রমে খোদ ইউরোপেই এ বিষয়ে বেশ প্রশংসনীয় কাজ হয়েছে। ফলে উনিশ শতকের শেষ দিকে এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকে বিবর্তনবাদের যে অপ্রতিহত প্রভাব ছিল এখন তার অনেকটাই নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। এক সময় অবস্থা এমন হয়েছিল যে, ডারউইনের মতবাদের সমালোচনা করা ছিল অমার্জনীয় অপরাধ। অনেকেই তখন বিবর্তনবাদের অপ্রতিরোধ্য বিজয় যাত্রার সামনে আত্মসমর্পণ করে আল-কুরআনের বিবরণ ও বিবর্তন-বাদের মাঝে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস চালিয়েছিলেন। এমনকি কেউ কেউ বিবর্তনবাদকে মূল ধরে কুরআনের একটা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা পেশ করার চেষ্টায় গলদঘর্ম হচ্ছিলেন। কিন্তু তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ডারউইনের বিবর্তনবাদের আজ আর সে গুরুত্ব নেই। এখন তা একটি ভ্রান্ত ও পশ্চাদ-গামী মতবাদরূপে পরিত্যক্ত। কিন্তু দুঃখজনক হলেও এটা সত্য যে, এ মূল্যবান অবদানের সবটুকু প্রশংসাই ইউরোপের প্রাপ্য। হায়! এ বিপ্লবী গবেষণা কর্ম যদি ইসলামী বিশ্বের কোন দেশে হতো। মিসরে, ইরাকে কিংবা মুসলিম ভারতে হতো। আফসোস, তা হয়নি। আরব বিশ্বের পণ্ডিত গবেষকগণ ইতিহাস ও সাহিত্যের ময়দানকেই শুধু গুরুত্ব দিয়েছেন, প্রয়োগিক বিজ্ঞান তথা ক্যামিস্ট্রি, ফিজিকস ইত্যাদিকে তেমন একটা গুরুত্ব দেন নি। ইসলামী দুনিয়ায় আজ পর্যন্ত এমন একটি প্রতিভার জন্ম হলো না যিনি কোন নতুন তত্ত্ব আবিষ্কারের মাধ্যমে বিজ্ঞানের জগতে আপন প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পারেন কিংবা কোন আন্তর্জাতিক সম্মান ছিনিয়ে আনতে পারেন।

নোবেল পুরস্কার ছিনিয়ে আনুন

আমার প্রিয় মুসলিম তরুণ শিক্ষার্থীবৃন্দ! কৃষিক্ষেত্রে আপনারা নোবেল পুরস্কার লাভ করার মত মৌলিক অবদান রাখুন। কোন মুসলিম বিজ্ঞানী গবেষক বৈজ্ঞানিক অবদান ও গবেষণা কর্মের জন্য নোবেল পুরস্কার পেলে মুসলিম বিশ্বের তরুণ শিক্ষার্থীদের মনে তা কি পরিমাণ উৎসাহ-উদ্দীপনা সঞ্চার করবে। 'আলিম সমাজের সঙ্গে আমার সম্পর্ক হলেও আমি সেই শুভদিনের অপেক্ষা করছি যেদিন শুনব যে, কোন ইসলামী দেশের কোন মুসলিম বিজ্ঞানী গবেষক কৃষি বা উদ্ভিদ বিজ্ঞানে মূল্যবান অবদান ও গবেষণা কর্মের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। আপনাদের পক্ষে হয়ত কল্পনা করাও সম্ভব নয় যে, মুসলিম বিশ্বের তরুণ শিক্ষার্থীরা এতে কত অনুপ্রাণিত হবে, তাদের কত আনন্দ, কত গর্ব হবে। আর এ আনন্দ এ গর্ব মোটেই দোষের নয়। রাজনীতির সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এজন্য কোন সরকারের সমালোচনারও অধিকার নেই। আমি ইসলামী বিশ্বের বিশেষ করে আরব বিশ্বের তরুণ শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, স্ব-স্ব ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণা কর্মে আত্মনিয়োগ করুন এবং এমন যুগান্তকারী অবদান রাখুন যেন গোটা বিশ্বের শ্রদ্ধাবিমুগ্ধ দৃষ্টি আপনাদের দিকে নিবদ্ধ হয়। অন্যান্য জাতি যেন একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, অতীতের মত এখনও মুসলমানদের মধ্যে রয়েছে অতুলনীয় মেধা, দুর্লভ প্রতিভা।

হৃদয়ের উর্বর পলি মাটিতে

আপনারাই মুসলিম বিশ্বের সম্ভাবনাময় সোনালী ভবিষ্যত। মুসলিম বিশ্বের কৃষি উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের প্রত্যাশা নিয়ে মুসলিম বিশ্ব তাকিয়ে আছে আপনাদের পানে। ভূমির গুণাগুণ, উৎপাদন ক্ষমতা, উর্বরতা এবং উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় ও পন্থা নিয়ে গবেষণা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল বাস্তবে প্রয়োগ করাই হবে আপনাদের আগামী দিনের দায়িত্ব। কিন্তু আমি আজ আপনাদেরকে আরেকটি উর্বর মাটির সন্ধান দেব। মুসলিম বিশ্বের কর্ণধাররা সে উর্বর মাটির দিকে খুব একটা মনোযোগ দেন নি। কখনো আমি মুসলিম উম্মাহর হৃদয়ভূমির কথা বলছি। এ হৃদয় ভূমিতে লুকিয়ে আছে অফুরন্ত সম্পদ-ভাণ্ডার এবং সুবিশাল শক্তি-সম্ভাবনা। এ অফুরন্ত সম্পদ-ভাণ্ডার আমাদেরকে আজ আহরণ করতে হবে। কাজে লাগাতে হবে

এ বিপুল শক্তি-সম্ভাবনা! আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও জাতীয় কর্ণধাররা এখনো পর্যন্ত এদিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করছেন না। অথচ বৃহত্তর ইসলামী উম্মাহর গণ্ডীতে যে সব জাতি এসেছে তাদের হৃদয়ে রয়েছে বিশ্বজয়ী ঈমানী শক্তি. রয়েছে আত্মত্যাগ ও কুরবানীর মহান জযবা। মানবতার কল্যাণ কামনা এবং মানব সেবার মহৎ প্রেরণায় তাদের হৃদয় উদ্দীপ্ত। প্রেম ও ভালোবাসার স্নিগ্ধতায় কুসুম কোমল এসব হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়েছে চির-প্রবহমান ফল্গুধারা। মুসলিম উম্মাহর হৃদয় ভূমির তলদেশে লুকিয়ে থাকা এ সম্পদ আজ উদ্ধার করতে হবে। এ সুপ্ত সম্ভাবনা এখন জাগিয়ে তুলতে হবে এবং সযত্ন লালন ও পরিচর্যার মাধ্যমে বিশ্বমানবতার কল্যাণে তা নিয়োজিত করতে হবে। আপনাদের আত্মত্যাগ ও জীবন সাধনার ফলে যদি এটা কোন দিন সম্ভব হয় তাহলে সেদিনই পৃথিবীতে আসবে সত্যিকার বিপ্লব, আসবে নীতি ও চরিত্রের আদর্শ পরিবর্তন। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কিংবা মৌলিক গবেষণা-কর্মের মাধ্যমে মানবতার অবক্ষয় রোধ এবং নীতি ও নৈতিকতার উৎকর্ষ সাধন সম্ভব নয়। দ্বিতীয় পথটাই হচ্ছে মানবতার কল্যাণ সাধনের প্রকৃত পথ; নীতি, স্বভাব ও চরিত্রে বিপ্লব সাধনের সঠিক উপায়। ইকবালের ভাষায়ঃ এ উপমহাদেশ সহ গোটা ইসলামী বিশ্বের নামে আমার বেদনাদগ্ধ হৃদয়ের অনুযোগঃ

نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں سے
وہی آب و گل ایران وہی تبریز ہے ساقی

আজমের সবুজ বাগে রূমীর মতো গোলাপ আর ফুটল না! অথচ সাকী! ইরানের সেই জলবায়ু এবং তাবরীযের সেই মাটি তো আজো আছে।

তবে ইকবাল নিজেই আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে গেছেন। সে সান্ত্বনা বাণীই আজ আপনাদের শোনাবঃ

نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویران
ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی

সাকী! এ বিরান উদ্যান সম্পর্কে এখনো আমি নিরাশ নই; (চোখের পানিতে) একটু ভিজিয়ে দেখো, এ মাটি কত উর্বর।

উর্বর ভূমি, প্রতিভা প্রসবিনী দেশ

কাজের ক্ষেত্র হিসাবে আল্লাহ্ পাক আপনাদেরকে পাকিস্তানের পাক ভূমি দান করেছেন। এদেশের মাটি যেমন উর্বর, তেমনি উর্বর এদেশের হৃদয় ভূমিও।

অনুরূপভাবে এশিয়ার অন্যান্য মুসলিম দেশও সুজলা সুফলা ও স্বর্ণ-প্রসবা। ইরাক যেমন দজলা ফুরাত বিধৌত, মিসর তেমনি নীলনদের অকৃপণ দানে সমৃদ্ধ আর সুদান সেই নীলনদের উৎসমুখ। এদেশগুলো যেমন সুজলা-সুফলা, তেমনি তা প্রতিভা-প্রসবিনীও। সুজলা-সুফলা কথাটা আপনাদের বুঝতে কোন কষ্ট হচ্ছে না। কিন্তু প্রতিভা-প্রসবিনী কথাটা মেনে নিতে হয়ত আপনাদের দ্বিধা বোধ হচ্ছে। কেননা ফসল ফলানোর প্রচেষ্টা এবং সবুজায়নের সাধনা চলছে সর্বত্র কিন্তু মানুষ গড়ার কাজ এবং প্রতিভা জন্মদানের মেহনত শুরু হয়নি এখনো। সেই দুরূহ অথচ অপরিহার্য কাজটাই আজ আপনাদের কাঁধে তুলে নিতে হবে। এমনো হতে পারে যে, একদিন আমরা শুনতে পাব—আপনাদেরই কেউ কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বভার লাভ করেছেন। আমার সামনে রাখা এই আরব তরুণদের অনেকেই হয় নিজ নিজ দেশের কৃষিমন্ত্রী হবেন। এটা বিপ্লব অভ্যুত্থানের যুগ, গণতন্ত্রের যুগ। সুতরাং এ সম্ভাবনা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, আজ এখানে যারা ছাত্র, স্বদেশে গিয়ে তারাই হবে সমাজ-সংগঠক, রাষ্ট্র পরিচালক, তারাই হবে দেশের রাজনীতি এবং অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক। আজ এই সুবর্ণ মুহূর্তে ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহর পক্ষ থেকে আমি আপনাদের পয়গাম দিচ্ছি ঃ স্বদেশের মাটিতে সবুজ ফসল ফলানোর মেহনতের পাশাপাশি সবুজ মানুষ গড়ার মেহনতও করে যেতে হবে আপনাদের। আমার কথা আপনারা বিশ্বাস করুন, আরব ও ইসলামী উম্মাহকে যে সকল আত্মিক যোগ্যতা আল্লাহ্ পাক দান করেছেন—ইউরোপ আমেরিকার জাতিসমূহ সেসব থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। এখনো মুসলমানদের মধ্যে যে পরিমাণ সহজ-সরলতা এবং ইখলাস ও নিঃস্বার্থপরতা বিদ্যমান রয়েছে তার অযুতাংশও খুঁজে পাওয়া যাবে না ইউরোপ আমেরিকার অমুসলিম জাতিবর্গের ব্যক্তি জীবনে, সমাজ পরিমণ্ডলে এবং জাতীয় পর্যায়ে। এ সরলতা ও নিঃস্বার্থপরতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে আমাদের। একজন মুসলমান অপর মুসলমানের সঙ্গে যে উষ্ণ আন্তরিকতা ও অপূর্ব হৃদতা নিয়ে মিলিত হয় তার তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না পৃথিবীর

অন্য কোন জাতির মাঝে। এমন এক ঈমানী শক্তি এখন ঘুমিয়ে আছে তাদের মধ্যে যা একবার জাগিয়ে তুলতে পারলে আল্লাহ্ ও রসূলের জন্য, দীন ও শরীয়তের জন্য জানমাল লুটিয়ে দিতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হবে না, তারা। স্বদেশবাসীর সেই সুপ্ত ঈমানী শক্তি জাগিয়ে তুলতে পারলে সবুজ বিপ্লবের সাথে সাথে এক সুমহান জীবন বিপ্লবও সাধিত হবে আপনাদের এ পাক ভূমিতে, বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় অভিভূত হবে গোটা বিশ্ব, মুক্তির আনন্দে উদ্বেল মানবতা আপনাদের জানাবে স্বকৃত অভিবাদন।

এখানেই আমি আমার বক্তব্যের ইতি টানছি এবং এখানে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে যারা আমাকে ইসলামী উম্মাহর এই উচ্ছল তারুণ্যের সাথে পরিচিত হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ দিয়েছেন তাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। সবশেষে আল্লাহ্ পাকের দরবারে আমার আকুল প্রার্থনা, এ বিশ্ববিদ্যালয়কে আল্লাহ্ পাকিস্তানসহ গোটা ইসলামী বিশ্বের জন্য গৌরব, কল্যাণ ও সমৃদ্ধির উৎস করুন।

ভালোবাসি সেই তরুণদের দূর তারকালোকে যাদের দৃপ্ত বিচরণ

(২৫শে জুলাই ১৯৭৮ পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি 'ইসলামী ছাত্র সংঘ' শাখার কর্মীশিবিরে প্রদত্ত ভাষণ। কর্মীশিবিরে পাঞ্জাব প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ছাত্র প্রতিনিধি এবং সংগঠনের নেতৃবৃন্দ যোগদান করেছিলেন।)

সেই তরুণদের আমি ভালোবাসি

আমার প্রিয় ছাত্র ভাইগণ! আপনাদের এ কর্মী শিবিরে এসে আমি যে আত্মিক সুখ অনুভব করছি তা নিছক শব্দের মালা গেথে আপনাদের বোঝানো সম্ভব নয়। এ সুখ ও আনন্দের গভীরতা তিনিই শুধু অনুভব করতে পারেন যিনি দাওয়াতের মাঠে কিংবা শিক্ষাঙ্গণের চার দেওয়ালের মাঝে অরুণ

প্রভাতের এই তরুণ দলের উষ্ণ সান্নিধ্যে জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ কাটিয়ে দিয়েছেন, এই সবুজ চারাগুলোর জীবনে সৌরভিত বসন্তের আয়োজনে বুকের রক্ত পানি করেছেন। এমন হৃদয় শুধু এ আনন্দের গভীরতা অনুভব করতে পারে. ইকবালের ভাষায় যার আজীবন আকাঙ্ক্ষা ঃ

"সেই সাহসী জওয়ানদের আমি খুঁজে ফিরছি যারা দূর তারকালোকে করে দৃপ্ত বিচরণ।"

محبت مجھے ان جوانوں سے ہے
ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند

আল্লাহ্‌র ঘরের পবিত্র পরিবেশে এতগুলো তরুণ প্রাণের একত্র সমাবেশ সত্যি আমার হৃদয়-প্রাণ জুড়িয়ে দেয়, যারা আল্লাহ্‌র সাথে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, সিরাতুল মুস্তাকীমে অবিচল থাকার কঠিন সংগ্রামে যারা প্রাণপণ, ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী আদর্শ চির সমুন্নত রাখতে যারা বদ্ধপরিকর।

সিরাতু'ল-মুসতাকীম পুলসিরাতের মতই কঠিন

সিরাতু'ল-মুস্তাকীমের উপর অবিচল থাকা স্বভাবত সহজ হলেও কখনো কখনো তা হয়ে পড়ে পুলসিরাতের মতই কঠিন, হাতের তালুতে জলন্ত অঙ্গার ধরে রাখার অগ্নি-পরীক্ষার মতই ভয়াবহ। তবে আমাদের উচিত কৃতজ্ঞচিত্তে আল্লাহ্‌ পাকের শোকর আদায় করা। কেননা এ পুলসিরাতের কঠিন অগ্নি-পরীক্ষার জন্য তিনি আমাদের নির্বাচিত করেছেন এবং এ পথে তিনি আমাদের পুরস্কৃত করতে চান। হাদীছ শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ কিয়ামতের দিন দুনিয়ার বিপদাপদের বিনিময়ে যখন বিভিন্ন পুরস্কার দেওয়া হবে তখন আল্লাহ্‌র রাহে অসংখ্য বিপদ-মুসিবত বরদাশ্‌তকারী মুজাহিদরা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে বলবে ঃ হায়! যদি আমাদের চামড়া কাঁচি দিয়ে কেটে কেটে তুলে ফেলা হতো। আল্লাহ্‌ পাকের শোকর আদায় করা উচিত যে, তিনি আমাদের এ অগ্নি-পরীক্ষার যোগ্য বিবেচনা করেছেন। সারা বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও কঠিন অধ্যবসায়ের পর কোন প্রতিভাবান ছাত্র পরীক্ষার হলে বসে সহজ ও সাধারণ প্রশ্নপত্র হাতে পেলে সে অবশ্যই ক্ষোভ প্রকাশ করবে ঃ কি জন্য ছিল আমার সারা বছরের এত পরিশ্রম, এত আয়োজন,

এত রাত্রি জাগরণ! পক্ষান্তর কঠিন প্রশ্নপত্র হাতে পেলে এই ভেবে তার তখন আনন্দের সীমা থাকে না যে, আমরা পরিশ্রম তবে সার্থক হলো। এটা মানব চরিত্রের বাস্তব ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।

সব কিছু সহজ হলে জীবন কঠিন হয়ে যেত

"দাওয়াত ও দীনের খিদমতের জন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে বড় নাযুক ও কঠিন সময় দিয়েছেন এবং চলার জন্য কণ্টকাকীর্ণ ও দুর্গম পথ নির্বাচন করেছেন"—এ ধরনের অনুযোগ করা আসলে ভীরুতা ও সাহসহীনতারই পরিচায়ক। দুঃসাহসী অভিযাত্রীকে ঝুঁকিহীন সাধারণ কোন অভিযানে পাঠালে সে উলটো এই বলে অভিযোগ জানাবে যে, আমার যোগ্যতার প্রতি **অনাস্থা** প্রকাশ করা হয়েছে। **জীবনের সবকিছু যদি সহজ হতো, চলার পথ** যদি হতো কুসুমাস্তীর্ণ, তাহলে জীবন এতটা উপভোগ্য, এতটা আনন্দময় হতো না; বিজয়ে, সফলতায় মনে জাগত না কোন শিহরণ। কবি বড় সুন্দর বলেছেন ঃ

جلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث
اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جاتا

প্রতিকূল ঘটনাপ্রবাহের ঝাপটা উপেক্ষা করে হেসে খেলে নির্ভয়ে আমি এগিয়ে যাই। জীবন সহজ ও অনুকূল হলে তা দুর্বিসহ হয়ে যেত।

আমি আপনাদের সামনে সুরাতু'ল-কাহ্‌ফের যে আয়াত তিলাওয়াত করেছি তা এ মুহূর্তে আমার অবচেতন মন আমার মুখে এনে দিয়েছে।

আপনাদের প্রতিপালক আপনাদের সম্বোধন করেছেন

انهم فتية امنوا بربهم و زدناهم هدى ওরা ছিল এমন ক'জন তরুণ যারা আপন প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছিল। আরবীতে فتى শব্দটি فتية-এর বহুবচন। অর্থ 'তরুণ'। এখানে অনেক ধরনের শব্দই হতে পারত। কিন্তু فتية-শব্দটিকে বিশেষভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এই তরুণ

ক'জন আপন প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছিল। ঈমানের এই প্রথম মনযিল অতিক্রম করার পর দ্বিতীয় মনযিলে আমি তাদের সাহায্য করেছি। زادهم هدى তাদের ঈমানের অবিচলতা আমি বৃদ্ধি করেছিলাম। আমার, আপনার যা করণীয় সর্বশক্তি দিয়ে তাই আমাদের করে যাওয়া উচিত। তবেই নেমে আসবে আল্লাহ্ পাকের মদদ। আল-কুরআনে আপনারা তিলাওয়াত করে থাকেন ويزدكم قوة الى قوتكم তোমাদের শক্তির সাথে তিনি তাঁর শক্তি যোগ করবেন। তোমাদের যা আছে তা তোমরা পেশ করে দাও; আমি তাতে বৃদ্ধি ঘটাব। ان تنصروا الله ينصركم তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করলে তিনিও তোমাদের সাহায্য করবেন। বনী ইসরাইলকে তাই সম্বোধন করে বলা হয়েছে :

يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم و اوفوا

بعهدي اوف بعهدكم -

"হে ইয়াকুবের বংশধর! আমি তোমাদের যে নিয়ামত দিয়েছি তা স্মরণ করে দেখ এবং আমার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর; আমিও তোমাদের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করব।" একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে পানির সংকটের কথা জানানো হলো। সেই মুহূর্তে তিনি দো'আর জন্য পবিত্র হাত দুটি উর্ধ্বে তুলে ধরতে পারতেন এবং হয়ত আকাশ থেকে অঝোর ধারে পানি বর্ষিতও হতো। কিন্তু তা না করে তিনি নির্দেশ দিলেন : যতটুকু পানি তোমাদের কাছে আছে তা এখানে নিয়ে এস। পানি হাযির করা হলে তিনি তাতে পবিত্র আংগুল রাখলেন। সাথে সাথে সেখান থেকে উৎসারিত হলো পানির ফোয়ারা। আরেকবার তাঁর খেদমতে আরয করা হলো : আমাদের কাছে পর্যাপ্ত খাদ্য নেই। তিনি বললেন : যার কাছে যা আছে সেগুলো নিয়ে এস। শুকনো খেজুর, শুকনো রুটি এবং অন্যান্য খাবার হাযির করা হলে দেখা গেল, পরিমাণে তা এতই অল্প যে,

দু'একজনের জন্যও তা যথেষ্ট হবে না। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম দো'আ করে তাতে পবিত্র হাতের স্পর্শ বুলালেন। সেই সামান্য পরিমাণ খাদ্যে আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে এমন বরকত নাযিল হলো যে, গোটা লশকরের লোক খেয়েও তা বেঁচে গেল। আল্লাহর রসূল হযরত 'ঈসা 'আলায়হি'স-সালামের মত এ দো'আও তিনি করতে পারতেন : ربنا انزل علينا مائدة من السماء হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য আসমান থেকে দস্তরখান নাযিল করুন। কিন্তু এ সহজ পন্থা তিনি গ্রহণ করেন নি। কেননা কিয়ামত পর্যন্ত আগত তাঁর উম্মতকে হাজারো চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করতে হবে, মুকাবিলা করতে হবে প্রতিকূল অনেক যুগ বিবর্তনের আর তা সম্ভব হবে কেবল তখন যখন উম্মত তার অন্তর্নিহিত শক্তি, মনোবল ও সংকল্পের পথে এগিয়ে যাবে। আপন জীবনেও সেই আদর্শই তিনি রেখে গেছেন তাঁর অনাগত উম্মতের জন্য। হাতে হাত রেখে বায়'আতের নিছক আনুষ্ঠানিকতা এখানে অচল। এখানে প্রয়োজন সেই বায়'আতের, যা শিক্ষা দেয় কর্মের, মেহনতের এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদের। এজন্যই সাহাবাদের তিনি নির্দেশ দিলেন, তোমাদের কাছে যা আছে সর্বাগ্রে তা পেশ কর। তোমাদের সর্বশেষ করণীয়টুকুও তোমরা করে নাও। তবেই আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে সাহায্য নেমে আসবে। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের মু'জিযাগুলোর ক্ষেত্রেও একই প্রক্রিয়া কার্যকর ছিল। নিরস্ত্র তিনশ তেরজন সাহাবাকে নিয়ে বদরের মাঠে মুশরকিদের বিরুদ্ধে তাঁকে দাঁড়াতে হয়েছিল। এক ফুয়ে সব উড়িয়ে দিতেও তো তিনি পারতেন, পারতেন শুধু একমুঠি কংকর নিক্ষেপ করে ময়দান জয় করতে। কিন্তু না, আল্লাহ্র নবীকে মদীনা থেকে বেরিয়ে সত্তর আশি মাইল পথ পাড়ি দিয়ে বদর যুদ্ধে হাযির হতে হয়েছিল। সেখানে সৈন্য বিন্যাস থেকে শুরু করে প্রচলিত যুদ্ধের সব কৌশলই তিনি গ্রহণ করেছিলেন একজন সুদক্ষ সেনাপতির মত। সবশেষে সেনাপতির জন্য নির্মিত খেজুর পাতার ডেরায় ঢুকে সিজদায় গিয়ে দু'চোখের পানিতে তপ্ত বালু ভিজিয়ে তিনি যে দো'আ করেছিলেন : اللهم ان تهلك هذه العصابة لن تعبد

হে পরওয়ারদিগার! তোমার বান্দাদের এ ক্ষুদ্র দলটি আজ ধ্বংস হয়ে গেলে পৃথিবীতে তোমার ইবাদত করার যে কেউ থাকবে না! মুসলিম জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং দাওয়াত ও জিহাদের ময়দানে এটাই সঠিক নববী তরীকা।

সেখানে রবূবিয়াতের প্রশ্ন ছিল

আপনাদের সামনে আমি আয়াত তিলাওয়াত করেছি। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন: إنهم فتية তারা ছিল হাতেগোনা কয়েকজন তরুণ মাত্র। সমসাময়িক সরকার জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ কুক্ষিগত করে রেখেছিল। সুতরাং সরকার খাদ্য সরবরাহ করলে তবেই ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে অন্ন জুটত। তেমনি সরকার চাকরী না দিলে মানুষকে ভোগ করতে হতো বেকারত্বের অভিশাপ। মোটকথা, সরকার যেন ছিল সে সমাজের ক্ষুদে 'রব'। آمنوا بربهم কিন্তু তারা তাদের আসল 'রব'-এর উপর ঈমান এনেছিল। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিল, আমাদের প্রতি-পালক, তথা রিযিকদাতা, জীবনের সকল প্রয়োজনের ব্যবস্থাপক এবং সম্মান ও মর্যাদা দানকারী তুমি নও; অন্য কোন মহান সত্তা। তিনি রাজাধিরাজ, তিনি রাব্বু'ল-'আলামীন, সারা বিশ্বের তিনি নিয়ামক, প্রতি-পালক। এই ক্ষুদ্র বিশ্বাসী তরুণ দলটি যখন তাদের বিশ্বাসের প্রথম মনযিল অতিক্রম করল তখন زدناهم هدى আমি তাদের ঈমানের অবিচলতা বৃদ্ধি করে দিলাম। এখানে একথা প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ্ পাকের মহান সত্তাই হচ্ছে হিদায়াতের উৎস। এখান থেকেই হয় মানুষের হিদায়াতের ফয়সালা। নিছক মেধা, প্রতিভা ও যোগ্যতাবলে কিংবা কুতুবখানার গ্রন্থরাজি অধ্যয়নের মাধ্যমে হিদায়াতের মহা দওলত হাসিল করা সম্ভব নয় কারো পক্ষে। আপন সত্তার সাথেই 'হিদায়াত'কে তিনি সম্পৃক্ত করে দিয়ে রাজকীয় ভঙ্গীতে বহুবচন প্রয়োগ করে ইরশাদ করেছেন: زدناهم هدى আমরা তাদের হিদায়াত তথা ঈমানের অবিচলতা বৃদ্ধি করে দিয়েছি। ফলে মুহূর্তের মধ্যে একেকটি স্তর অতিক্রম করে হিদায়াতের সুউচ্চ সোপানে তাদের ঘটেছে উত্তরণ। আল্লাহ্র সামনে তারা মস্তকাবনত হয়েছিল, আল্লাহ্র সামনেই প্রার্থনার হাত দুটি প্রসারিত করেছিল, আল্লাহ্র সুমহান সত্তা ও গুণাবলীর পরিচয় ও মারেফাত লাভের মেহনত করেছিল, সেজন্য ত্যাগ স্বীকার করেছিল, আর তাই "আমরা তাদের ঈমান ও হিদায়াতের অরিচলতা বৃদ্ধি করে দিয়েছি।"

তরুণদের ঈমানী উদ্দীপনা

এবার তাদেরকে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হলো। এ ঘটনা সেই সময়কালের যখন খৃস্টধর্ম আপন উৎসভূমি সিনাই থেকে ছড়িয়ে পড়ে রোমে নতুন নতুন প্রবেশ করেছিল। সেখানে ছিল গোড়া প্রতিমা পূজারীদের অখণ্ড রাজত্ব। খৃস্ট ধর্ম-প্রচারকরা সেখানে দাওয়াতের কাজ শুরু করলে তরুণ সমাজে তার শুভ প্রভাব পড়ল। ইতিহাসের বিভিন্ন মোড় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দেখা যায়—তরুণরাই প্রভাবিত হয়েছে সবার আগে। কেননা বুড়োরা আবদ্ধ থাকে অনেক বন্ধনে। সে বন্ধন ছিন্ন করে ইতিহাস ও যুগ-বিপ্লবের ডাকে সাড়া দেওয়া সব সময় সম্ভব হয় না তাদের পক্ষে। যেমন ধরুন—সাঁতার কাটার জন্য আপনারা নদীতে গিয়ে থাকেন। হালকা পাতলা ও মেদহীন লোকের পক্ষে যতখানি সহজ-স্বাচ্ছন্দে সাঁতার কাটা সম্ভব—মেদবহুল লোকের পক্ষে কিংবা বিরাট কোন বোঝা মাথায় নিয়ে ততটা সহজে সম্ভব নয়। দেখা যাবে মাঝপথে গিয়েই হয়ত সে হাঁপাতে শুরু করেছে, কিংবা ডুবে যেতে বসেছে।

পারিবারিক ঐতিহ্য, সামাজিক রীতিনীতি, সম্মান, প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি কিংবা রাজা-বাদশাহদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং শাহী দরবারের ভীতি ও মোহ বুড়োদের পথে যেমন বাধার বিরাট পাহাড় হয়ে দাঁড়ায়—তরুণদের বেলায় তেমনটি হয় না। কেননা কাঁচা বয়সের উদ্দীপনায় ওরা উদ্দীপ্ত। শিরায় শিরায় ওদের টগবগ করে উষ্ণ রক্ত, মনে থাকে নতুন সৃষ্টির স্বপ্ন, নতুনের ডাকে সাড়া দেওয়ার এক সর্বজয়ী উদ্যম ও স্বভাব প্রেরণা। তাই বাধার বিন্ধ্যাচল ওরা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয় অবলীলাক্রমে, নতুনের ডাকে সমুখপানে এগিয়ে যায় দৃপ্ত পদক্ষেপে (এই উচ্ছল তারুণ্যেরই জয় গান গেয়ে গেছেন আমাদের বুলবুল কবি—উষার দুয়ারে হানি আঘাত, আমরা আনিব রাঙা প্রভাত, আমরা টুটাব তিমির রাত, বাধার বিন্ধ্যাচল। অনু-বাদক)। সে যুগের তরুণদের কানে এলো নতুনের ডাক, চিরন্তন সত্যের সঞ্জীবনী আহবান, ওরা শুনতে পেলো নবসৃষ্টির জয়গান। দেখুন না! কুরআনুল করীমে তখনকার কি সুন্দর চিত্র তুলে ধরেছেন আল্লাহ্ পাক।

ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا -

"হে পরওয়ারদিগার! আমাদের সত্যগ্রহণের ইতিবৃত্ত শুধু এইটুকু যে, সত্যের পথে আহবানকারী এক 'মুনাদী' আমাদের আহবান জানাল: "আপন প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন।" মুনাদীর সেই আহবানে সাড়া দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমরা ঈমান নিয়ে এলাম।" বুড়োদের মত এই তরুণদের পায়ে কোন শিকল ছিল না, মনে ছিল না সামাজিক সম্মান, প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা খোয়ানোর ভয়। তাই তারা গর্বভরে বলতে পারল: "আমরা ঈমান নিয়ে এলাম।"

কাঁটাবন ও পুষ্পোদ্যান

ঈমানদার তরুণদের জীবনেও এলো অগ্নিপরীক্ষার সেই সব স্তর যা দাওয়াত ও জিহাদের ময়দানে এক মুজাহিদের জীবনে সচরাচর এসে থাকে। এ পরীক্ষাকালে কখনো নিজেকে সে দেখতে পায় ফলে ফুলে সুশোভিত এবং ঝলমল গন্ধে সুরভিত, ছায়াঘেরা এক সবুজ উদ্যান, যেখানে আছে পাখীর গান, আছে ফুলপরীদের হাস্য-কলতান, আছে ফুলের পাপড়িতে কোমল স্পর্শ আর আছে জীবন উপভোগের মোহিনী হাতছানি। আবার খানেক নিজেকে সে দেখতে পায় এক বিষাক্ত কাঁটাবনে; পদে পদে বিষকাঁটা সেখানে পায়ে বিঁধে, রক্ত ঝরায়. বিচ্ছু যেখানে দংশন করে, সর্প যেখানে ছোবল হানে, বিষ ছড়ায়। মোটকথা, একদিকে থাকে বিভিন্ন প্রলোভন, বড় বড় পদের প্রস্তাব, বৈষয়িক উন্নতি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার অবারিত সুযোগ এবং জীবন উপভোগের সকল আয়োজন-উপকরণ আর অন্যদিকে থাকে লোমহর্ষক শাস্তির হুমকি, থাকে সম্পদ ও প্রতিষ্ঠা হারানোর ঝুঁকি—এমনকি থাকে জীবন নাশের পায়তারাও। বিজ্ঞজনদের মতে কাঁটাবনের তুলনায় পুষ্পোদ্যান পেরিয়ে আসাটাই অনেক বেশী কঠিন। ভীতি ও হুমকির তুলনায় প্রলোভন অনেক বেশী কার্যকর। আপনাদের হয়ত জানা থাকবে যে, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র)-কে উভয় পরীক্ষারই সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁর জীবনে। খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহর যুগে রাষ্ট্রীয় পোষকতায় মু'তাযিলী সম্প্রদায় মুসলিম সমাজে এ বিশ্বাসের প্রসার ঘটাল যে, কুরআন আল্লাহ্‌র কালাম হয়েও সৃষ্ট। এই ভ্রান্ত আকীদার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন মর্দে মু'মিন, শেরে খোদা ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল। দরস-গাহের মসনদ ছেড়ে বেরিয়ে এলেন তিনি। তাঁর ঈমান তাঁকে পরিণতির কথা ভাববার অবকাশ দিল না মুহূর্তও। তাই আহত শার্দুলের ন্যায় গর্জে উঠলেন এই নতুন রাষ্ট্রীয় গোমরাহীর বিরুদ্ধে।

সাথে সাথে শুরু হলো পরীক্ষা, সাপ বিচ্ছুভরা এক সুদীর্ঘ কাঁটাবন পাড়ি দেওয়ার অগ্নি পরীক্ষা। দরবারে ডেকে খলীফা মু'তাসিম তাঁকে চাপ দিলেন এতদ-সংক্রান্ত শাহী ফতওয়ায় দস্তখত দিতে। অত্যন্ত তেজোদ্দীপ্ত ভাষায় তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন খলীফার প্রস্তাব। খলীফা তাকে শাসালেন, কঠিন শাস্তির হুমকি দিলেন। কিন্তু তিনি মচকালেন না। প্রশান্ত চেহারায় নূরের এক স্বর্গীয় অভিব্যক্তি নিয়ে শুধু বললেন: এটা শরীয়তের সুস্পষ্ট বিরোধী, সুতরাং আমার পক্ষে কিছুতেই তা সম্ভব নয়। আরেকদিন দরবারে ডেকে খলীফা বললেন: আহমদ! আমার কথা মেনে নিলে আমার যুবরাজ পুত্রের মতই তুমি আমার প্রিয়পাত্র হবে এবং সিংহাসনে আমার পাশে বসার মর্যাদা পাবে। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের সেই অনমনীয় জওয়াব: কুরআন-সুন্নাহ্‌র কোন দলীল পেশ করুন, নির্দ্বিধায় আমি মেনে নেব। খলীফার চরম কথা: শেষবারের মতো ভেবে দেখার সুযোগ তোমাকে দেওয়া হলো। জওয়াবে তাঁর প্রশান্ত মুখে মৃদু হাসির রেখা খেলে গেল মাত্র। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের এ হাসির সাথে পরিচিত ছিলেন খলীফা মু'তাসিম, তাই ক্রোধে গর্জে উঠে জল্লাদকে নির্দেশ দিলেন: মার কোড়া। প্রচণ্ড শব্দে একেকটি কোড়া এসে আছড়ে পড়তে লাগল ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের খোলা পিঠে। দরদর করে বয়ে চলল লাল তাজা রক্ত, কিন্তু তিনি প্রশান্ত, নির্বিকার। জল্লাদের ভাষ্য—আল্লাহ্‌র কসম! সেই একটি কোড়া হাতির পিঠে পড়লেও তা চিৎকার করে ছুটে পালাত।

এরপর এলো দ্বিতীয় পরীক্ষা। মু'তাসিমের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে মুতাওয়াক্কিল মসনদে আরোহণ করলেন। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলকে তিনি খলীফাদের বিনোদন ও বিশ্রামের শহর সামেররায় আমন্ত্রণ জানালেন এবং শাহী সম্মান ও মর্যাদায় তাঁকে বরণ করলেন। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল পাথেয় হিসাবে সাথে করে গমের ছাতু এনেছিলেন। প্রয়োজনে তাই তিনি খেতেন, শাহী দস্তরখানের খাবার স্পর্শও করতেন না। পরে খলীফা মুতাওয়াক্কিল আশরাফীর তোড়া উপহার পাঠাতে শুরু করলেন। ইমাম সাহেবের পুত্র বর্ণনা করেন, "আব্বা প্রায় বলতেন: মু'তাসিমের কোড়ার চেয়ে মুতাওয়াক্কিলের তোড়া আমাকে অধিক পরীক্ষায় ফেলেছে।"

বাতিল শক্তি যুগে যুগে সত্যপন্থীদের বিরুদ্ধে দু'টো অস্ত্রই সমানভাবে প্রয়োগ করেছে। বাতিল যখন মনে করেছে যে, কোড়ার আঘাতেই সত্যের

কণ্ঠ স্তব্ধ করা সম্ভব, তখন তাই সে করেছে সীমাহীন নিষ্ঠুরতার সাথে। আবার যখন মনে হয়েছে যে, জল্লাদের কোড়ার চেয়ে আশরাফীর তোড়াই এখানে কাজ হাসিলের জন্য অধিক সহায়ক, বাতিল তখন সেই ফুটপাতেরই আশ্রয় নিয়েছে নির্লজ্জ শঠতার সাথে। আর জল্লাদের কোড়ার তুলনায় আশরাফীর তোড়ার পরীক্ষাই হচ্ছে কঠিন। আবার অনেক সময় কোড়া কিংবা তোড়ায় কাবু না হলেও মা-বাবার ও প্রিয়জনদের চাপ আবদারের কাছে নতি স্বীকার করতে হয় মানুষকে। পরবর্তী পর্যায়ে এই তৃতীয় পরীক্ষাও এলো ইমানের বলে বলীয়ান সেই তরুণদের জীবনে। তাদের মা-বাবারা আগে থেকেই শাহী দরবারের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল, ছিল বিভিন্ন পদ ও মর্যাদায় সমাসীন। তাদের বলা হলো ঃ বখে যাওয়া ছেলেদের বুঝিয়ে পথে আনার চেষ্টা কর। ভুল করে ওরা দুষ্টলোকের ফাঁদে পা দিয়েছে। ওদের বুঝিয়ে বলো আমাদের ধর্ম মতে ফিরে এসে নিজ নিজ ভবিষ্যত গড়ার সুযোগ ওরা গ্রহণ করুক। তোমাদের পরে দরবারে তোমাদের পদ ও মর্যাদাকে সামলাবে তোমাদের ছেলেরাইতো। দেখো, তোমাদের এই বখে যাওয়া ছেলেরা নিজেদের পায়ে নিজেরাই যেমন কুড়াল মারছে তেমনি তোমাদের পদমর্যাদা ও প্রতিষ্ঠার জন্যও হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এ চেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল, আর তখনই বাতিল তার সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল এই ক্ষুদ্র দলটির বিরুদ্ধে। শুরু করল ব্যাপক ধরপাকড়, পাশবিক নিপীড়ন। এ সময় প্রয়োজন ছিল আল্লাহ্‌র বিশেষ মদদ ও নুসরতের। এ হচ্ছে সেই কঠিন মুহূর্ত যখন পরীক্ষা জর্জরিত মু'মিনদের হৃদয়ের গভীর থেকে বেরিয়ে আসে জিগর ফাটানো, আরশ-কাঁপানো ফরিয়াদ متى نصر الله কখন! কখন আসবে আল্লাহ্‌র মদদ ?

মু'মিন চিত্তের স্থিরতা

যথাসময়ে আল্লাহ্‌র মদদ নেমে এল। و ربطنا على قلوبهم আমরা তাদের হৃদয় মযবুত এবং মনোবল অটুট করে দিলাম। তাই জালিমের সকল নিপীড়ন নির্যাতন উপেক্ষা করে নতুন বলে বলীয়ান হয়ে তরুণ দল ঘোষণা করল ربنا رب السموات و الارض, আসমান যমীনের যিনি রব, তিনিই আমাদের রব - لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا আমরা কখনো তাঁকে ছাড়া অন্য কোন ইলাহের উপাসনা করবনা। আমাদের

মুখ থেকে এ ধরনের কোন কথা বের হলে সেটা হবে বড় অন্যায় কথা। هولاء قومنا اتخذوا من دونه الهة আমাদের স্বগোত্রীয় লোকদের দেখলে মনে হয় কত স্থিরমতি বুদ্ধিমান, কত ভাবগম্ভীর, অভিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান! অথচ তারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে একাধিক ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে। لولا يأتون عليهم بسلطان بين নিজেদের হাতে গড়া এই ইলাহদের স্বপক্ষে কোন যুক্তি দলীল তারা পেশ করে না কেন। আল্লাহ্‌র নামে যারা অপরাধ আরোপ করে তাদের চেয়ে বড় অপরাধী, বড় অবিচারক আর কে?

তিনটি শিক্ষা

আমার প্রিয় ভাইয়েরা! কিঞ্চিত ব্যাখ্যাসহ সূরাতু'ল-কাহফের যে কয়টি আয়াত আমি আপনাদের সামনে তিলাওয়াত করলাম তা থেকে আমরা তিনটি মৌলিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।

প্রথমত, পর্বতের মত অবিচল ও সুদৃঢ় ঈমান হাসিল করতে হবে আমাদের। আল্লাহ্‌ এবং আল্লাহ্‌র পবিত্র গুণাবলীর উপর আমাদের ঈমান হবে অন্তর্দৃষ্টিতে স্নাত এবং আত্মিক শক্তিতে সুসংহত। শিক্ষার্থী, বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিকদের ঈমান হবে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও যুক্তির আলোকে উজ্জ্বল, আর সাধারণ জনতার ঈমান হবে ভক্তি, বিশ্বাস ও আস্থা-নির্ভর।

দ্বিতীয়ত, হিদায়াতের যিনি উৎস, হিদায়াত প্রাপ্তির জন্য যাঁর করুণা প্রাপ্তি হলো পূর্বশর্ত—সেই মহান সত্তার সাথে আমাদের সম্পর্ক হতে হবে সুগভীর, সুনিবিড়। কুরআন-সুন্নাহ অধ্যয়ন, নবী ও সাহাবী চরিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ এবং শহীদ ও মুজাহিদদের পূত-পবিত্র জীবন থেকে আদর্শ গ্রহণের মাধ্যমে পর্যাপ্ত শক্তি ও খাদ্য যোগাতে হবে আমাদের ঈমান ও বিশ্বাসকে। ব্যাটারী যেমন চার্জ করতে হয়, সেল (cell) পুরোনো হয়ে গেলে তা যখন বদলে নিতে হয় তেমনি আমাদের ঈমান ও বিশ্বাসকেও ঝালিয়ে নিতে হবে বারবার। আমরা সবাই আজ জড়বাদী বিশ্বে বাস করছি। যাদের কাছে আমরা লেখাপড়া করছি সেই শিক্ষা-গুরুদের অনেকে নিজেরাই ধর্মবর্ণিত অদৃশ্য জগতের মহাসত্যে পূর্ণ বিশ্বাসী নন। পদে পদে আমাদের সমাজে এমন সব অন্তরায় বিদ্যমান যা মানুষকে প্রতি মুহূর্তে ঠেলে দেয় খোদা বিস্মৃতির অতল গহ্বরে। খোদা বিস্মৃত করার সাথে সাথে এ পাপী সমাজ আত্মবিস্মৃত হায়েনায় পরিণত করছে আমাদেরকে।

টেলিভিশন বলুন, রেডিও বলুন, সংবাদ-পত্র জগত কিংবা সাহিত্যাঙ্গন বলুন সর্বত্র আজ একই কলুষিত পরিবেশ। সাহিত্যকে মনে করা হয় নির্মল অনুভূতির পবিত্র বাহন, জাতীয় সত্তার বিকাশ ও লালন ক্ষেত্র। অথচ সেই সাহিত্যই আজ হয়ে পড়েছে নগ্নতা-অশ্লীলতা ও আদিম পাশবিকতায় সমাজ বিষিয়ে তোলার মোক্ষম হাতিয়ার। মোটকথা, মানুষের যে সমাজে আমাদের বাস তা আজ ভেসে গেছে পাপের বন্যায়,—ধর্ম বিস্মৃতি ও খোদা গাফিলতির মহা সয়লাবে। আমাদের পরিবেশ পরিস্থিতি, এমনকি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাও আমাদের নিক্ষেপ করছে নাফরমানী ও খোদ্রোহিতার সেই অরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সাগরে। মজার ব্যাপার এই যে, ডুবিয়ে মারার সব আয়োজন সম্পন্ন করে সমাজপতিরা ভারিক্কি চালে এখন আমাদের নসিহত খয়রাত করে বলছেন—সাবধান বাছারা! কাপড় ভিজিওনা যেন। সমাজ জীবনের এ পাপ কুলষতা থেকে নিজেকে আর সমাজের মানুষকে বাঁচাতে হলে আমাদের আজ অনুধাবন করতে হবে আল-কুরআনের চিরন্তন ঘোষণা زادهم هدى ,-এর মর্মবাণী। হৃদয়ের অন্ধকার দেশে আজ জ্বালাতে হবে ঈমানের জ্যোতির্ময় নূরানী প্রদীপ। তখনই কেবল সম্ভব হবে কুপ্রবৃত্তির ছোবল থেকে আত্মরক্ষা করা। শুধু সুশৃংখল সাংগঠনিক শক্তি বলে বা নৈতিক বিধিমালা দ্বারা সম্ভব নয় আজকের জড়বাদী সভ্যতার বিরুদ্ধে সফল প্রতিরোধ গড়ে তোলা। জীবন ও জগতের পরীক্ষিত সত্য আমি আপনাদের বলছি—সময় এতটা মারমুখি এবং সময়ের দাবী ও চাহিদা এমনই সর্বগ্রাসী যে, ঈমানী শক্তি এবং নবী জীবনের সুমহান আদর্শ ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার আর কোন উপায় নেই।

সশস্ত্র বস্তুবাদের সফল মুকাবিলা

ঈমান ও অস্তিত্ব রক্ষাকারী এ মহা সংগ্রামে সশস্ত্র বস্তুবাদের সফল মুকাবিলা করতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে গায়বী মদদ লাভ করতে হবে, অর্জন করতে হবে রূহানিয়াতের মহা শক্তি। সে জন্য আমাদের নামায হতে হবে বিশুদ্ধ, ইহসান ও আধ্যাত্মিকতায় সমৃদ্ধ, কেননা নামাযই মু'মিনের হৃদয়ের আধ্যাত্মিক শক্তি যোগায়, আর যোগায় নিরব রাতের ইবাদত ক্লান্ত দু'হাতের অশ্রুসজল মুনাজাত এবং ভক্তিআপ্লুত ও ভাবমগ্ন হৃদয়ে আল-

১. হাদীছের পরিভাষায় ইহসানের দুটি অর্থ ঃ অন্তরে এমন অনুভূতি সৃষ্টি করা —যে আল্লাহকে আমি দেখতে পাচ্ছি কিংবা নিদেনপক্ষে আল্লাহ আমাকে দেখছেন।

কুরআনের তিলাওয়াত। সেই সাথে প্রয়োজন আল্লাহ্‌র প্রেমিক বান্দাদের সংস্পর্শের। কেননা আল্লাহ্‌র দুনিয়ায় এঁরা হলেন পরশ পাথর। এঁদের সান্নিধ্যে আমাদের মন পবিত্র ও বিশুদ্ধ হবে; ইশক ও প্রেমের উত্তাপে হৃদয় দগ্ধ হবে এবং সেখানে জাগ্রত হবে আল্লাহ্‌র দীদার লাভের আকাংখা।

য়ুরোপ আমেরিকা তথা পাশ্চাত্য সভ্যতা বস্তুবাদকে আজ সজ্জিত করে রেখেছে নতুন নতুন অস্ত্রে, আধুনিকতম সাজ-সরঞ্জামে। আমরা যদি মনে করে থাকি যে, শুধু সাংগঠনিক শক্তি এবং উপায়-উপকরণ ও সাজ-সরঞ্জামের বলেই আমরা এর প্রতিরোধ করতে সক্ষম হব তাহলে আমরা মারাত্মক ভুল করব। আর হয়ত আগামী দিনে সে ভুলের ক্ষতিপূরণও সম্ভব হবে না আমাদের পক্ষে। এজন্য চাই অসীম ঈমানী শক্তি, চাই আল্লাহ্‌র সাথে প্রগাঢ় সম্পর্ক, আর চাই এমন সিজদার তাওফীক যার প্রচণ্ড চাপ এই জড় পৃথিবীও সইতে না পারে। কবির ভাষায় ঃ

وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی
اس کو آج ترستے ہیں منبر و محراب

কোথায় সে সিজদা যা কাঁপিয়ে দিত পৃথিবীর আত্মা! তেমন সিজদার তরে আজ কেঁদে মরে মিম্বর ও মিহরাব।

আমাদের সিজদা অন্তত এমন তো হবে যা প্রাণ কাঁপিয়ে দেয়, হৃদয় উদ্বেলিত করে তোলে এবং চোখে অশ্রু ঝরায়। আমাদের নামাযে, আমাদের সিজদায়, আমাদের তিলাওয়াতে এবং আমাদের মুনাজাতে এই প্রাণ ও সজীবতা যখন সঞ্চার হবে তখনই কেবল আমরা সক্ষম হব বস্তুবাদ ও ভোগবাদের সফল মুকাবিলা করতে।

আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে আমাদের সম্পর্ক হতে হবে প্রেম ও মুহব্বতের। সেই সাথে আমাদের মনে থাকতে হবে সুন্নতের গুরুত্ব এবং নবী আদর্শের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধাবোধ। ত্রুটি-বিচ্যুতি সবারই হয়, কিন্তু সাফাই পেশ করার পরিবর্তে ত্রুটিকে ত্রুটি বলে স্বীকার করার প্রশংসনীয় মনোভাব থাকতে হবে। অনুশোচনা-দগ্ধ মনে একথা স্বীকার করতে হবে যে, নবী জীবনই আমাদের আদর্শ এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে সে মহান আদর্শই আমাদের অনুসরণ করা উচিত। এ ধরনের মনোভাব থাকলে আল্লাহ্ অবশ্যই

তাওফীক দেবেন এবং ত্রুটি-বিচ্যুতিও ক্ষমা করবেন। বড় জটিল ও নাযুক সময় আমাদের জন্য আল্লাহ্ পাক নির্বাচন করেছেন। আমরা যদি দীন ও শরীয়তের দাবী পূর্ণ করে ইসলামের ঝাণ্ডা সমুন্নত রাখার পবিত্র জিহাদে নিজেদের উৎসর্গ করি তাহলে দুনিয়াতে তার সুফল তো আছেই, পরকালে এমন অফুরন্ত কল্যাণের অধিকারী আমরা হব যা এই জড় পৃথিবীতে বসে আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়।

ইসলামের হাতে আগামী দিনের নেতৃত্ব

ইসলামী উম্মাহর জন্য এটা এক বিরাট সৌভাগ্যের ইঙ্গিতবহ যে, তরুণদের মধ্যে আজ ইসলামী আন্দোলনের জোয়ার এসেছে। এটা নিছক ঘটনাচক্রের ব্যাপার নয়। লাহোরে এসে আপনাদের দেখছি, ইতিপূর্বে করাচীতেও দেখে এসেছি, আর তারও আগে দেখে এসেছি মিসরে, সিরিয়ায়। সেসব দেশের ইউনিভার্সিটি, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং মেডিকেল কলেজের তরুণদের মধ্যে এমন ইসলামী জযবা ও উদ্দীপনা দেখে এসেছি যা দুঃখের বিষয়, আমাদের এখানের অনেক দীনী প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের মধ্যেও সচরাচর দেখা যায় না। সিরিয়ার অবস্থা তো রীতিমত আমাকে মুগ্ধ করে দিয়েছে, জানি না সেখানকার কলেজ ভার্সিটির ছাত্রীদের মধ্যেও এ প্রেরণা কোত্থেকে এল যে, প্রকাশ্যেই আজ তারা ইসলামের পক্ষে কথা বলছে এবং ইসলামের নামে বড় বড় ত্যাগ স্বীকার করছে। তাদের মধ্য থেকেই আজ দাবী উঠেছে ইসলামী পর্দার সপক্ষে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের সুস্পষ্ট বক্তব্যঃ আমাদের ইসলামী পর্দার সাথে লেখাপড়ার সুযোগ না দিলে ভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। এটা নিছক ঘটনাচক্রের ব্যাপার নয়। পাকিস্তানের বিশেষ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে তরুণদের মধ্যে আজ এক মহা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এটাই আল্লাহ্পাকের মঞ্জুর। মনে হচ্ছে পর্দার আড়ালে এক অদৃশ্য শক্তি কাজ করে যাচ্ছে। নইলে আপনারাই বলুন, ভার্সিটির তরুণদের মনে এ উৎসাহ, এ উদ্দীপনা কে এনে দিল? তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহ্ পাকের এটাই মঞ্জুর যে. ইসলামী উম্মাহর ভাগ্য পরিবর্তনের এ সংগ্রামে তরুণরাই এবার অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে এবং তাদের হাতেই অর্পিত হবে আগামী দিনের গোটা ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বভার। কেননা انهم فتية امنوا بربهم ওরা সেই তরুণদল যারা তাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছে।

আমি আমার সীমিত অভিজ্ঞতার আলোকে আরো কয়েকটি কথা আপনাদের খিদমতে আরয করতে চাই।

চরিত্র গঠন করুন

প্রথম কথা এই যে, সর্বাগ্রে ব্যক্তি চরিত্র গঠনের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করুন। এ ছাড়া সফলতা লাভের আশা সুদূরপরাহত। আমাদের ইসলামী আন্দোলনগুলোর সবচেয়ে বড় ত্রুটি ও দুর্বলতা এই যে, ব্যক্তি চরিত্র গঠনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়না, ফলে আন্দোলনের উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছে তরুণরা হিম্মত হারিয়ে ফেলে এবং আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়ে কিংবা পরিচালিত হয় ভ্রান্ত পথে। পক্ষান্তরে কুরআন-সুন্নাহ্ ও নববী আদর্শের ছাঁচে তরুণদের জীবন ও চরিত্র গঠন হলে সে আন্দোলনের সফলতা নিশ্চিত, তা কখনো ঝিমিয়ে পড়ার বা বিভ্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকে না।

আত্মসমালোচনা করুন

দ্বিতীয় কথা এই যে, আপনাদেরকে আত্মসমালোচনার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এ যুগের একটি বড় দোষ এই যে, অন্যের ছিদ্রান্বেষণে আমাদের আগ্রহের কোন কমতি হয় না, অথচ নিজেকে মনে হয় যেন শিশির ধোয়া দুর্বাঘাস। বর্তমান সমাজে দর্শন ও রাজনীতি আমাদের মধ্যে এমন এক অসুস্থ মানসিকতা সৃষ্টি করে দিয়েছে যে, নিজেদের দোষ ত্রুটি সম্পর্কে আমরা থাকি সম্পূর্ণ বে খবর অথচ অন্যের দোষত্রুটির উপর আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে সর্বদা। "অমুক দল এই করেছে", "অমুক ব্যক্তি দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছে" এই আমাদের দিন-রাতের জপমালা। ফলে আত্মসমালোচনা করার এবং সংশোধনের উদ্দেশ্যে নিজের দোষত্রুটিগুলি খুঁজে বের করার কারোই ফুরসত হয় না বড় একটা।

ইতিবাচক কর্মকাণ্ডকে অগ্রাধিকার দান

তৃতীয় কথা এই যে, নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের তুলনায় ইতিবাচক কর্মকাণ্ডকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং উভয় ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ভারসাম্য রক্ষা করে এগুতে হবে। সবকিছুকেই সমালোচনার চোখে

দেখার ক্ষতিকর মানসিকতা যেন আপনাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ না করে সে দিকে কড়া নজর রাখতে হবে। উম্মতের কোন একটা অংশের কাছে যদি আপনারা দীনের আলো পান, তাদের সান্নিধ্য যদি আপনাদের মধ্যে ঈমানের অনুভূতি জাগ্রত করে, নামাযের প্রতি প্রেম-অনুরাগ বৃদ্ধি করে তাহলে তত-টুকুকেই আল্লাহ্‌র নিয়ামত মনে করুন। সেইটুকু নিজেদের মধ্যেও আহরণ করার চেষ্টা করুন। এই বলে তাদের অবজ্ঞা করা উচিত নয় যে, 'দীনের পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধি তাদের নেই ; সুতরাং তারা দীনের সত্যিকার ধারক ও বাহক নয় এবং তাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়।' কারণ একমাত্র নামাযটাই দীনের একটা বিরাট অংশ। হাদীছ শরীফে নামাযকে বলা হয়েছে দীনের কেন্দ্রীয় স্তম্ভ। সুতরাং তাদের সান্নিধ্যে এসে যদি প্রাণবন্ত নামায আপনি শিখে যেতে পারেন, সিয়ামের আত্মিক স্বাদ অনুভব করতে পারেন তাহলে মনে করতে হবে জীবন গঠনের দুঃসাহসী অভিযাত্রায় আপনি অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। সুতরাং এটা অবজ্ঞার বিষয় নয়।

ব্যাপক অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করুন

চতুর্থ কথা এই যে, বিস্তৃত ও গভীর অধ্যয়নে এখন থেকে আপনাদের আত্মনিয়োগ করতে হবে। সুগভীর ও সুবিস্তৃত জ্ঞানই দীনের পথে আপ-নাদের এ বিপদসংকুল অভিযাত্রাকে নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করবে। আপনাদের সরাসরি পরিচিত হতে হবে ইসলামের মূল উৎস কুরআন-সুন্নাহ্‌র সাথে। একটা কথা ; মনে রাখবেন, আরবী ভাষায় পূর্ণ অভিজ্ঞতা ও পরিপক্কতা ছাড়া দীনের কোন মৌলিক বিষয়ে আস্থা ও নির্ভরতার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। নির্ভরযোগ্য,ও ভ্রান্তিমুক্ত সব ধরনের দীনী সাহিত্যই আপনাদের অধ্যয়ন করা উচিত। এক ধরনের কিংবা এক ব্যক্তির রচনা-সম্ভারে আপনাদের আবদ্ধ থাকা উচিত নয়। উম্মাহর জন্য রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামই হচ্ছেন সর্বাংগীন ও পূর্ণাঙ্গ মডেল। বিরাট প্রতিভার অধিকারী হয়েও অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে দীনের সকল বিষয়ে, সকল ক্ষেত্রে একক মডেল হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং কোন ব্যক্তি সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করা উচিত নয় যে, ইনিই সর্বশেষ মডেল। সুতরাং অন্য কোন মাডেলের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই অন্য কোন সাহিত্য বা রচনা-সম্ভারের। এ ধরনের সংকীর্ণতা আপনাদের মত তরুণ ও নিবেদিত-প্রাণ মুজাহিদদের অন্তত থাকা উচিত নয়।

জীবনের শুরু থেকে আমার ব্যক্তিগত রুচি এটাই এবং অন্যদেরও আমি এই পরামর্শই দিয়ে থাকি যে, অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বৈচিত্র ও ব্যাপকতা অবশ্যই থাকা উচিত এবং যে কোন ভালো লেখাই পড়ে দেখা উচিত। তবে এতটুকু যোগ্যতা অবশ্যই থাকতে হবে যাতে পঠিত বিষয়ের ভালোমন্দ এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করা সম্ভব হয়।

আমার হৃদয়ে আপনাদের জন্য স্থান রয়েছে

পূর্ণ আন্তরিকতা এবং কল্যাণ কামনার স্নিগ্ধতা নিয়ে উপরের কথাগুলো আমি আপনাদের বলেছি। এখানে আপনাদের মাঝে আমার উপস্থিতিই প্রমাণ করে যে, আপনাদের জন্য আমার হৃদয়ে স্থান রয়েছে, রয়েছে গভীর মর্যাদাবোধ। হযরত ওমর (রা.)-এর একটি আবেগপূর্ণ বক্তব্য সব সময় আমার মনে দোলা দেয়। বিশিষ্ট সাহাবীদের এক মজলিসে হযরত ওমর (রা.) একবার বললেন ঃ আসুন, আজ আমরা আল্লাহ্‌র দরবারে যার যার মনের বাসনা পেশ করি। কেউ আল্লাহ্‌র পথে অকাতরে ব্যয় করার বাসনা প্রকাশ করলেন, কেউবা অধিক ইবাদতের তাওফীক প্রার্থনা করলেন। কিন্তু হযরত ওমরের পালা এলে তিনি বললেন ঃ আমার স্বপ্ন এই যে, মদীনার ঘরে ঘরে খালিদ ও আবূ উবায়দার মত বীর সন্তান জন্ম নেবে। আর গোটা দুনিয়ায় ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাদের আমি পাঠিয়ে দেব দিকে দিকে। আজ এ আশা আমরা কাদের কাছে করতে পারি? আপনাদের মত অরুণ প্রাতের তরুণ দলের কাছেই তো!

পরিশেষে আমি আল্লাহ্ পাকের শোকর আদায় করি এবং আপনাদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আপনাদের কাছে আসতে পেরে, মনের ব্যথা আপনাদের কাছে খুলে বলতে পেরে আমি আনন্দিত, পরিতৃপ্ত।

বদনজর থেকে আল্লাহ্ আপনাদের হিফাজত করুন। বদনজর শব্দটি খুবই ব্যাপক অর্থবহ, আর সেই ব্যাপক অর্থেই আমি তা ব্যবহার করছি। আল্লাহ্ আপনাদেরকে নিজেদের এবং অন্যদের বদনজর থেকে হিফাজত করুন এবং আপনাদের মেধা, প্রতিভা ও যোগ্যতাকে যথাস্থানে ব্যয় করার তাওফীক দান করুন।

নববী 'ইলমের তালিবগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বক্তৃতামালা

(পাকিস্তানের আরবী মাদরাসাসমূহ এবং অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে দীনী 'ইল্‌ম অধ্যয়নরত ছাত্র-তরুণদের উদ্দেশ্যে যেসব ভাষণ দেওয়া হয়েছিল।)

(ইসলামাবাদে জামিয়াই-ই-তা'লীমাত-ই ইসলামিয়ার ছাত্র-শিক্ষক ও শহরের সুধী জনসমাবেশে প্রদত্ত ভাষণ। ২৩শে জুলাই ৭৮ ইং তারিখে জামিয়ার প্রশস্ত হলরুমে অনুষ্ঠিত হয় এ সমাবেশ। পরিচিতি ও স্বাগত ভাষণ দেন জামিয়ার নাজিম মাওলানা হাকীম আবদুর রহীম আশরাফ। সমাপনী ভাষণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জামেয়া ইসলামিয়া মদীনা মুনাওয়ারার অধ্যাপক মাওলানা আবদুল গাফ্‌ফার হাসান।)

যুগের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় উম্মতে মুহাম্মদীর কর্তব্য

হামদ ও সালাতের পর ঃ

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ

آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ـ

মাননীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, অধ্যাপকবৃন্দ ও প্রিয় ছাত্রগণ! এ অনুষ্ঠানে হাযির হয়ে আমি আনন্দিত। কারণ, এখানে অপরিচয়ের অস্বস্তি অনুভব করছি না এবং তা করা বাঞ্ছনীয়ও নয়। কেননা, আমরা সকলে অভিন্ন ভাষা ও মনের অধিকারী, একই জাহাজের যাত্রী, একই কাফেলার মুসাফির অর্থাৎ 'ইল্‌মে দীনের কাফেলা, ইসলামের দাওয়াতবাহী মুসলমানদের কাফেলা।

সময়ের চ্যালেঞ্জ

আমি মনে করি বস্তুবাদ, কামনাবৃত্তি ও সম্পদের আধিক্য হচ্ছে এ যুগের সবচেয়ে ভয়াবহ সমস্যা ও ভয়ংকর বিপদ তথা, আধুনিক ভাষায় বলতে "কঠিনতম চ্যালেঞ্জ"। এ বিপদ বিদ্যমান ছিল সব যুগেই। কিন্তু এ যুগের ন্যায় শক্তিধর, সুপরিকল্পিত ও যুক্তি-দলীল সমৃদ্ধ ছিল না আর কখনও। এটা বাস্তব যে, বিগত বস্তু ও জড়বাদের অগ্রগতির দিনে যারা তার শীর্ষে অবস্থান করছিল, তারাও ছিল হীনমন্যতায় আক্রান্ত। তারা ছিল স্বভাবের দাস এবং ক্ষমতা ও সম্পদের পূজারী। কিন্তু তাতে গর্ব করার দুঃসাহস তাদের ছিল না; বরং অপরাধবোধ অবনত করে রাখত তাদের মাথা। প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করেও তারা মন-মস্তিষ্কের প্রশান্তি আহরণে নিজেদের মনে করত অক্ষম। সে যুগের ইতিহাস পড়ে দেখুন, জড়বাদ পূজারীদের মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করুন, আপনি সম্যক অবগত হবেন যে, সে যুগের উন্নত চরিত্রের অধিকারী আধ্যাত্মিক ব্যক্তিবর্গের প্রতি শ্রদ্ধায় ঐ জড়বাদীরা পর্যন্ত মস্তকাবনত হয়ে থাকত, তাঁদের কাছে আসতে অপ্রস্তুত বোধ করত, তাঁদের সামনে চোখ তুলে তাকাতে লজ্জা পেত। কারণ তখনও পর্যন্ত তাদের অভ্যন্তরে "নফ্‌সে লাওয়ামাহ" (অন্যায় অপরাধবোধ জাগ্রতকারী বিবেক) বেঁচে ছিল। কুকর্ম ও অপকীর্তির পরও তারা অনুভব করত তাদের ভ্রান্তি। জড়বাদের শীর্ষে অবস্থানকারী সেরা ব্যক্তিরাও একাকী নির্জনে অনুশোচনায় কেঁদে ফেলত। বিবেকের দংশনে কখনও বা তারা অপরাধের স্বীকৃতি দিয়ে চিৎকার করে উঠতঃ আমরা ভ্রান্তিতে ভুগছি, আমরা ফেঁসে গিয়েছি কামনা পূজার পাঁকে।

দৃষ্টিভঙ্গিতে অভিন্ন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

বিগত যুগের জড়বাদের কথা বললাম। কিন্তু আজকের ভোগবাদী বস্তুবাদ সব সংকোচ ও দুর্বলতার উর্ধ্বে দুঃসাহসী অকুতোভয়। ভোগবাদকে সভ্যতা ও উন্নতির সর্বোচ্চ শিখর ভাবাই হচ্ছে এ যুগের বৈশিষ্ট্য। জড়বাদে নেই পূর্ব পশ্চিমের বিভেদ মতানৈক্য। মতপার্থক্যের বিষয় হল, জড়বাদের প্রসার প্রক্রিয়া কিরূপ হবে? কোন দল ও মতবাদের নিয়ন্ত্রণে তা পরিচালিত হবে? পশ্চিমের গুরু আমেরিকার দাবী হল, ব্যক্তির নিরংকুশ মালিকানা ও ব্যয় উপার্জনে স্বাধীনতা বনাম যথেচ্ছাচার একটি বৈধ ও

নির্ভুল বিধি। পক্ষান্তরে পূর্ব দেশীয় সমাজবাদীদের উস্তাদ রাশিয়ার বিশ্বাস হল ব্যক্তি, গোষ্ঠি কিংবা গ্রুপের ইজারাদারী ভ্রান্ত পথ। জীবনোপকরণ হবে সর্বব্যাপক, সর্ব সাম্যের অধীন। তা নিয়ন্ত্রণ করবে সরকার' নামের একটি যন্ত্র।

কিন্তু জীবন যাপন পদ্ধতি কি হবে? শক্তি-সামর্থ্য ব্যয়িত হবে কোন্ ধারায়? জীবন সংগঠন, উপকরণ ও উদ্দেশ্যে সদ্ভাব ও সমঝোতা হবে কি করে? উপকরণসমূহ জীবন যাত্রার সহায়ক হতে পারে কেমন ব্যবস্থায়? জীবনের গন্তব্য ও লক্ষ্য কি হওয়া উচিত? মানব উন্নতির রহস্য লুকায়িত কোথায়? এ সব প্রশ্নের উত্তরে উল্লিখিত দর্শনদ্বয়ে কোন দ্বন্দ্ব বা বিরোধ নেই। উভয় দর্শনের ঐকমত্যে মুখ্য উদ্দেশ্য হল, ভোগ, প্রতিপত্তি ও ইচ্ছার নিরংকুশ স্বাধীনতা ও যথেচ্ছাচারের মাধ্যমে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা চরিতার্থ করা, রক্ত-মাংসের এ দেহের চাহিদা পুরণ করা। মন (প্রবৃত্তি) যা চায় তাই করতে দেওয়া, দেহকে শুইয়ে রাখা বিলাস আবেশে---এসব হচ্ছে জীবনের লক্ষ্য। পিছনে নেই কোন কেন্দ্র, সামনে নেই কোন গন্তব্য, জওয়াবদিহি করতে হবে না কারো সামনে। তাদের মতে, নৈতিকতা, অধ্যাত্মবাদ কিংবা আকীদা ও মূল্যেবোধের দাবীদার কোন দর্শনই এর চাইতে উন্নততর নয়। এ চিন্তাধারার বাইরে নেই কোন বাস্তবতা, কোন জীবন রহস্য। পৃথিবীর বুকে বিদ্যমান সম্পদ ও সুযোগের সদ্ব্যবহার তথা সর্বসাকুল্যে তা ভোগ করাই হচ্ছে পৃথিবীতে আমাদের জন্মলাভের একমাত্র উদ্দেশ্য। এ কথাই হচ্ছে নিরেট বাস্তব ও নির্ভুল তত্ত্ব-রহস্য। পৃথিবীর ভাণ্ডারগুলি উপভোগে উজাড় করা, নিজেদের মাঝে তা বন্টন করে নিয়ে জীবনের স্বাদ ভোগ করা, এ পথে কোন অন্তরায় দেখা দিলে তা উৎখাত করাই হচ্ছে কর্মসূচী ও কর্মপন্থা। উভয় দর্শনের লক্ষ্য অভিন্ন---ভোগ আর ভোগ। অবশ্য তার অন্তরায় কি কি তাতে মতপার্থক্য রয়েছে। কারো মতে রাজতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ, গোষ্ঠিতন্ত্র, একচ্ছত্র আধিপত্য এর অন্তরায়। কারো মতে ব্যক্তি মালিকানা, কারো দর্শনে পুঁজিবাদ ও শোষণবাদী বুর্জোয়াতন্ত্র হচ্ছে প্রতিবন্ধক। কেউ বলেন, মূল বাঁধা হচ্ছে বন্টনে অনিয়ম। কারো মতে অশিক্ষাই বিপত্তি। কেউ বা বলেন, আদর্শ, শক্তি ও সংগঠনের অনুপস্থিতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে সমস্যা। মোটকথা, মতভেদ যা তা' রয়েছে শাখা-প্রশাখা ও অন্তরায় চিহ্নিতকরণে; লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে রয়েছে ঐকমত্য। সময়ের বিবর্তনে জড়বাদ যেভাবে সংগঠিত, যেভাবে তা পরিশোধিত হয়েছে,

নামের মাহাত্ম্য ও লেবেলের মনোহারিত্বে তা যেভাবে ঝিলমিল করছে, তার 'শোরুমে' যে উজ্জ্বল চোখ ধাঁধানো সাইনবোর্ড ঝুলানো হয়েছে, দেশ ও জাতির শ্রেষ্ঠ ও উন্নত মেধাগুলি যেভাবে তার অগ্রগতি সাধনে নিয়োজিত রয়েছে, জড়বাদ ও বস্তুবাদকে গ্রহণীয় ও ব্যাপকতর করার তৎপরতা চলেছে, তা ইতিহাসের সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করে ফেলেছে। ভোগবাদ হল কঠিনতম চ্যালেন্জ। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলতে পারি, ভোগবাদী বস্তুবাদই কঠিনতম চ্যালেন্জ। নিরেট বাস্তব এটাই। এর প্রকরণ ও শাখা-প্রশাখা বহুবিধ ও বহুরূপী হতে পারে, কিন্তু মৌলিক সত্তা তার একটাই। তা হল বস্তুগত ভোগবাদ, পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, সামাজিক সাম্যবাদ কিংবা অন্য যে কোন অর্থ বা দর্শন হোক, সবই হচ্ছে এর শাখা-প্রশাখা। বস্তুবাদ ও প্রবৃত্তি পূজাই হচ্ছে সবগুলির কেন্দ্রবিন্দু ও অভিন্ন মৌলিক সত্তা (common factor)।

বস্তুবাদকে আঘাত হানে যে চিরন্তন সত্য

যুগ যুগ ধরে মানুষ ছিল তার পেটের দাস, জৈবিক চাহিদা ও আদিম প্রবৃত্তির গোলাম। সম্পদ-সম্পত্তি ও নারীই ছিল মানুষের দৃষ্টিতে বাস্তব সত্য। বিপুল সংখ্যক মানুষ মস্তক ঠেকাত সৃষ্ট জীবের পায়ে, প্রভু স্বীকার করত মাখলুক্কে। অন্য দিকে যুগ যুগ ধরে আগমন ঘটেছে আম্বিয়া আলায়হিমু'স-সালাম-এর। তাঁরা পরিচয় দিয়েছেন আর এক অদেখা জগতের যা এ জগতের চাইতে প্রশস্ততর, মৌলিকত্বে ও সৌন্দর্যে অতুলনীয়। তাঁরা বলেছেন, সে জগতের দর্শন লাভ করলে এ জগতে অবস্থান হয়ে পড়বে অসহনীয়, যাতনায় পরিপূর্ণ, যেমন অবস্থা হয় পানির মাছকে ডাংগায় তুলে ফেললে কিংবা আকাশের পাখীকে সংকীর্ণ খাঁচায় আবদ্ধ করলে যেভাবে তা ছট্‌ফট্ করে উড়ে পালাতে চায়। সে জগত একবার অবলোকন করলে তোমাদের চোখ খুলে যাবে, এ পৃথিবী হয়ে যাবে ঘৃণার্হ। এ পৃথিবী, যার পেছনে দৌড়ে তোমরা বিসর্জন দিচ্ছ তোমাদের অমূল্য সম্পদ, তোমাদের জ্ঞান, নৈতিকতা ও তোমাদের আত্মার দাবী---এ পৃথিবী তোমাদের কাছে তখন মনে হবে আবর্জনা আর দুর্গন্ধের ডিপো। দুর্গন্ধের ডিপো কিংবা আবর্জনা স্তুপের মাঝে কাউকে দাঁড় করিয়ে রাখলে যেমন দুর্গন্ধে তার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে, মাথা চক্কর দিয়ে বমি আসতে থাকে, তোমাদের অবস্থাও হবে তদ্রূপ। আসমানী ঐশী গ্রন্থমালা এ সত্যটি ঘোষণা করেছে

এই ভাষায়ঃ قل متاع الدنيا قليل "এ পৃথিবীর উপকরণসমূহ (নাস্তিতুল্য) তুচ্ছ।" কখনো বলা হয়েছে, 'প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিচূর্ণ শস্যতুল্য', 'কুড়া ভুসিতুল্য', কোথাও বলা হয়েছে ঃ كزرع اعجب الكفار نباته 'ফসল, যা দেখে কৃষকের চোখ জুড়ায়, মন আনন্দে উদ্বেলিত হয়, মুখ ভরে যায় উপভোগ-স্পৃহার লালায়, আবেগাপ্লুত হয়ে বলে ওঠে—কি সুন্দর এ ফসল, কত সুন্দর তার রঙ-বৈচিত্র্য!' কিন্তু অতর্কিতে আসে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বান, খরা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি। কৃষক তার কাঁচি লাগিয়ে দেখে কিছুই নেই—শুধু পোড়া খড়, বিচূর্ণ ভুসি।

শিশুর খেলনা জগত আমার নজরে

সর্বাগ্রে এ শাশ্বত, বাস্তব ও চিরন্তন সত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে পয়-গম্বরগণের পবিত্র মুখেঃ এ দুনিয়া খেলাঘর। ধুলোবালি দিয়ে শিশু নির্মাণ করে তার মনমত এক প্রাসাদ, সেখানে রচনা করে সংসার। ক্ষণিক পরেই নিজ হাতে তা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। হয়ত আবার গড়ে, আবার ভাঙে নিজেই। খেলা এমনই হয়। আল্লাহ্ পাক এ সত্য উন্মোচিত করে দিয়েছেন জ্ঞানীজন ও বাস্তবানুসন্ধানী রহস্যবিদদের কাছে। ইতিহাস পড়ুন, আপনার দৃষ্টিও দেখতে পাবে তার সুস্পষ্ট ছবি।

স্বপ্নই ছিল আমার দেখা সেই জগত

একবার আমরা বাগদাদ মিউজিয়াম দেখতে গেলাম। সেখানে থরে থরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিভিন্ন সভ্যতা-সংস্কৃতি। ইউফ্রেটিস (ফোরাত নদী) অববাহিকার সভ্যতা, নমরুদ ও কত জানা-অজানা রাজবংশের ঐতিহাসিক স্মৃতি। স্তরক্রমে সাজানো রয়েছে নিকট অতীতের আব্বাসী যুগ, সালজুকী, তাতার, মোগল ও তুর্কী যুগ। একটু পরেই এল ইংরেজ ও ফয়সাল বিন হুসায়নের যুগ। বিশ্বাস করুন, প্রাচীরের পর্দায় এত দ্রুত উত্থান-পতন দেখে আমার মাথা চক্কর খেতে লাগল। মনে হচ্ছিল যেন কোন কড়া ঔষধ কিংবা ঔষধের ওভারডোজ (Over Dose) আমি গলাধঃকরণ করেছি। আমি হাঁপিয়ে উঠলাম। হাজার কিংবা পাঁচ শ' বছর লেগেছিল তাদের উত্থান-পতনে, আমাদের সামনে তা ঘটতে লাগল মিনিট ও ঘন্টার হিসাবে। তাহলে সময়ের এ ব্যবধান স্বপ্ন নয় তো কি? ঐসব যুগে

যারা বসবাস করেছে, তারা তো ভেবেছিল হাজার বছর! কিন্তু কোথায়? তা যে দু'ঘন্টা মাত্র। সব ম্যাজিক, সব ভোজবাজি! আমরা দাঁড়িয়ে আছি সভ্যতা ও মানবতার ধ্বংসস্তূপের উপরে। আমরা আমাদের অতীত দেখে অনুধাবন করছি, আমাদের পরবর্তীরা মিউজিয়ামে আমাদের ইতিহাস দেখে বলে উঠবে قل متاع الدنيا قليل—বলুন পৃথিবীর সব উপকরণ নিতান্তই বাজে, নগণ্য, অস্থায়ী।

মন লাগিয়ে রাখার ক্ষেত্র নয় এ পৃথিবী

কিন্তু পৃথিবী সম্পর্কে এ বাস্তব সত্য সকলের দৃষ্টিতে প্রস্ফুটিত নয়। কেননা আল্লাহ্ এ পৃথিবীকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আবাদ রাখতে চান। সেটাই তাঁর হিক্‌মত—সৃষ্টি রহস্য। তাই সাধারণ মানুষের কাছে পৃথিবীর স্বরূপ তিনি খুলে দেন নি যেমন তিনি করেছেন আল্লাহ্-প্রেমিক অধ্যাত্ম জ্ঞানীদের জন্য। তাহলে পৃথিবী উজাড় হয়ে যেত। কারো মনে জাগ্রত হত না বাড়ী তৈরী করার সাধ, কল-কারখানা কিছুই তৈরী হত না। আল্লাহ্‌র হিক্‌মতই পৃথিবীর রহস্য লুকিয়ে রেখেছে। কেননা বাস্তবতার প্রকাশ ঘটিয়ে দ্বিতীয় জগতে (আখিরাতে) ঘটিতব্য সব কিছু দেখিয়ে দিলে মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ত। হয়ত (তীব্র বাসনায়) তার শ্বাস ফুরিয়ে যেত কিংবা সে দু'হাত বন্ধ করে বসে থাকত, তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ত অংগুলি হেলান।

নবীগণ ('আলায়হি'স-সালাম) এবং তাঁদের নায়েবগণের অবিচল হৃদয় সব দেখে শুনেও নির্লিপ্তভাবে দায়িত্ব পালন করেছে। তাঁরা যথাযথভাবে আদায় করেছেন আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শী এবং সকল মানুষের প্রাপ্য হক। পৃথিবীতে তাঁদের অবস্থান ও জীবন যাপনে কোন ব্যতিক্রম নেই। পৃথিবীর সাধারণ মানুষের মতই যথানিয়মে বাড়ীঘর, ঘর-সংসার করেছেন এবং তাতে সুরুচির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা ছিলেন প্রশান্ত ও অবিচল, তাদের জীবন পরিক্রমা ছিল তাঁদের যোগ্যতার সাক্ষী। যে গ্রামে বা গন্‌জে, যে শহরে ও মহল্লায় তাঁরা বসবাস শুরু করতেন তাঁদের কল্যাণ স্পর্শে তা হয়ে যেত কলুষতা ও কদর্যতা থেকে পবিত্র, কিন্তু মুহূর্তের জন্যও তাঁরা মোহগ্রস্ত হয়ে পড়তেন না। আজীবন তাঁদের বক্তব্য ছিল اللهم لا عيش الا عيش الآخرة। "ইয়া আল্লাহ্! আখিরাতের জীবনই জীবন।" কেননা তাঁরা ছিলেন পৃথিবীর পরিণতি সম্পর্কে সম্যক্ অবগত। তাঁরা ঘর-বাড়ীও তৈরী করেছেন,

আবার মসজিদও নির্মাণ করেছেন। ইসলামের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেছেন। বিজয় অভিযানে বেরিয়ে দেশের পর দেশ আল্লাহ্‌র বিধানের অধীনস্থ করেছেন। উদ্ভাবন ও প্রসার ঘটিয়েছেন নতুন নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের। সুদৃঢ় ভিত্তি রেখেছেন চিরঅনুসরণীয় ইতিহাসের। মোটকথা, পৃথিবীর সাধারণ বাসিন্দাদের মতই জীবন যাপন করেছেন তাঁরা। কিন্তু ব্যবধান ছিল এখানে যে,তাঁরা শেষ গন্তব্য মনে করতেন না পৃথিবীকে। পৃথিবী ছিল তাঁদের দৃষ্টিতে পথের প্রথম মন্‌যিল। এটাই আমাদের ও তাঁদের মাঝে ব্যবধান।

বস্তুবাদ : বাহন না আরোহী

বস্তুবাদের ভেল্‌কিবাজি যাঁরা ফাঁস করে দিয়েছিলেন, সে সকল মনীষী নিজেদের মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন বস্তুবাদের নাগপাশ থেকে। তাঁরা বস্তুকে বানিয়ে রেখেছিলেন গোলাম, বস্তুর গোলামী করেন নি কখনো। বস্তুর বাহন না হয়ে তাঁরা হয়েছিলেন আরোহী। মূল ব্যবধান ওখানেই যে, আমরা বাহন হয়েছি কিংবা নিরুপায় আরোহী نحن هائمة بلا كبح هـ سيس كراكب هـ بلا نحن হাতে নেই লাগাম, পা পিছলে গেছে পাদানি থেকে। আমাদের অবস্থা বল্গা ছেঁড়া ঘোড়ার আরোহীর ন্যায় উপায়হীন। বস্তুবাদ আমাদের দিশেহারা পথিকের ন্যায় ঘুরিয়ে মারছে অন্ধ গলিতে। ঘোড়ার গতি নিয়ন্ত্রণ করা বা তার পিঠ থেকে নেমে পড়া এ দুই কাজের কোনটিরই পন্থা আমরা 'রপ্ত' করতে পারছি না। বাহন আমাদের নিয়ে কোন পরিখায় লাফ দিল বা কোন খাদে কিংবা কোন সাগরবক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ল কিনা তা আমাদের জ্ঞাতব্যের বাইরে। এটা শুধু ব্যক্তির অবস্থা নয়, গোটা সভ্যতা এখন বল্গাহারা, নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত। আর যুগস্রষ্টা মনীষীরা আজীবন বস্তুবাদকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা উচ্চতর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের দান করেছিলেন অল্পে তুষ্টির সৌভাগ্য, যাঁরা রাজা-বাদশাহদেরও পরওয়া করতেন না। তাদের সাথে এমনভাবে কথা বলতেন, যেন রোগীর সাথে কথা বলছেন। তাঁরা ছিলেন নিজেদের অবস্থায় সন্তুষ্ট। তাঁরা রোগীর প্রতি সমবেদনা পোষণ করতেন। বেচারা বাদশাহদের বিপদাক্রান্ত ভেবে তাদের প্রতি দয়ার্দ্র হতেন। সে বেদনাবোধে কোন ভনিতা ছিল না, তা' ছিল একান্ত আন্তরিক। রুস্তম পাহ্‌লোয়ান রিব্'ঈ বিন 'আমিরের কাছে তাঁর আগমনের কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন

পৃথিবীর কাল কুঠরী থেকে প্রশস্ততার জগতে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। আবু ধাবীতে এক বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম—তিনি যদি জওয়াবে বলতেন, দুনিয়ার সংকীর্ণতম কারাগার থেকে আখিরাতের সুপ্রশস্ত জান্নাতে নিয়ে যাবার জন্য, তাতেও আমি মোটেই বিস্মিত হতাম না। কেননা প্রত্যেক মুসলমানই বিশ্বাস করে الدنيا سجن المؤمن و جنة الكافر দুনিয়া মু'মিনের কারাগার আর কাফিরের জান্নাত (হাদীছ)। পৃথিবী তো একটা খাঁচামাত্র। আমার বিস্ময় হল প্রয়োজনীয় অন্নের অভাবী, ক্ষুধায় পেটে পাথর বাঁধা হাড্ডিসার কংকালে পরিণত—আল্লাহ্‌র সে বান্দারা কি দেখেছিলেন? কি দেখে তারা বলতে পেরেছিলেন, "পৃথিবীর অন্ধকার কারাগার থেকে তোমাদের নিয়ে যেতে চাই উন্মুক্ত প্রান্তরে।" আরবের জীবন-প্রান্তর কি সত্যই উন্মুক্ত ছিল? জীবনোপকরণ কি সেখানে ছিল না সীমিত? বরং সম্পূর্ণ অনুপস্থিত! পেটপুরে একবেলা খাওয়াই তো ছিল তাদের জন্য দুষ্কর। উটের চামড়ার তৈরী তাঁবু কিংবা মাটির তৈরী কুঁড়েঘর ছিল তাদের বাসগৃহ। কোন শিকার পেলে কিংবা উট যবাহ্ করলে তা হতো তাদের আনন্দের দিন। বিস্ময়ের ব্যাপার হল, কী দেখে তাঁরা প্রতিপক্ষকে বলতে পেরেছিলেন: 'নিজেদের খবর নাও, তোমরা রয়েছ পিঞ্জরাবদ্ধ, তাতে রেখে দেওয়া হয়েছে নগণ্য পরিমাণ খাদ্য। আর তাই খেয়ে তোমরা আনন্দে আত্মহারা। এস, তোমাদের উপভোগ করাব আযাদীর স্বাদ।' এই ছিল সে যুগের মুসলিম মনীষীদের দৃষ্টিভঙ্গী। তাঁরাই হলেন 'উলামায়ে রাব্বানী। লোকেরা তাঁদের সান্নিধ্যে পেত বস্তুমোহের সুচিকিৎসা। তাঁদের দেখে মনে হত কত সুখ আনন্দের জীবন যাপন করছেন তাঁরা যেন জান্নাতের অনাবিল অফুরন্ত সুখ! তাই তো শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (র) বলেছিলেন, الجنة في صدري "আমার জান্নাত আমার বক্ষ মাঝারে।" এমন নিশ্চিত বলার সাহস তাঁরা পেলেন কোথায়? তাঁদের নির্ভরতা ছিল আল্লাহ্‌র প্রতি। তাঁরা ছিলেন অকুতোভয়। তাঁদের অন্তরে ছিল সদা আল্লাহ্‌র শোক্‌র। নামায ছিল তাঁদের মনের মাধুরী। দু'আয় তাঁরা পেতেন প্রশান্তি। প্রতি মুহূর্তে যেন তাঁরা জান্নাতে অবগাহন করতেন। সাধারণ দর্শকদের দৃষ্টিতে তাঁরা ছিলেন দুনিয়ার বাসিন্দা, কিন্তু মূলত তাঁরা ছিলেন জান্নাতুল ফেরদাউসে। আবেগাতিশয্যে তিনি একবার বলে ফেললেন—লোকেরা আমার কি চুরি করবে? কি ছিনিয়ে নেবে? আমার শান্তির উপকরণ তো আমার মনের মাঝে। কেউ তা বের করে নিতে পারে কি?

কোন আল্লাহ্ওয়ালা বলেছেন—আল্লাহ্‌র কসম! পৃথিবীর লোকেরা যদি আমাদের সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশের খোঁজ পেয়ে যায়, তাহলে এক মুহূর্তও আমাদের সুস্থির থাকতে দেবে না। খোলা তরবারি হাতে রাজা-বাদশাহ্‌দের ন্যায় আমাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে এই সংকীর্ণতম পরিমণ্ডল থেকেও আমাদের উৎখাত করে দেবে। নির্জনতায়, মসজিদ ও খানকাহ্‌র কোণেও আমাদের অবস্থানের সুযোগ দেবে না। তাদের ধারণা হবে, সেখানে লুকানো রয়েছে কোন বহুমূল্য ভাণ্ডার। মুসল্লা বিছিয়ে এত মগ্নতা, একাগ্রতা, ক্ষুধা-পিপাসার নেই কোন অনুভূতি! ব্যাপার কি? নিশ্চয় মুসল্লার নীচে রয়েছে কোন অন্তঃস্রোত, কোন পাইপ লাইন, সেখান থেকে আসছে খাদ্য ও পানীয়, সেখান থেকে ফুটে বেরুচ্ছে সুখ-আনন্দ। কাজেই তারা আমাদের মুসল্লা থেকে উৎখাত করে নির্বাসিত করবে বনে-জংগলে, আর ঐস্থান খনন করবে মহাসম্পদ প্রাপ্তির আশায় যেমন খনন করা হয় কালো সোনা পেট্রোলের উদ্দেশ্যে।

কা'না'আত (অল্পে তুষ্টি, লোভহীনতা) এক অমূল্য রতন

সুধীবৃন্দ! মূল সমস্যার মুকাবিলা করতে পারেন শুধু এমন আলিমগণ, যাঁদের মাঝে অল্পে তুষ্টির মৌলিক স্বভাব বিদ্যমান যাঁরা কোন ফাঁদে ধরা দেন না। কখনো ধরা পড়ে গেলে তাঁদের বক্তব্য হয় ঃ

برو این دام بر مرغ دگر نه - که عنقا را بلند است آشیانه

"হটাও ও ফাঁদ পেতে দাও অন্য কোন পাখীর তরে। অসীম উচ্চতায় বাসা বাঁধে বলাকারা।" অর্থাৎ হটে যাও, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাও অন্য কোথাও। আমাদের কেনা যায় না পয়সার বিনিময়ে, পদমর্যাদার বিনিময়ে, মসনদের বিনিময়ে। আমরা বেচতে পারি না আমাদের বিবেক, হৃদয়ের প্রশান্তি। সে আশা দুরাশামাত্র। আল্লাহ্ওয়ালাদের প্রতি লক্ষ্য করুন! দিল্লীর বাদশাহ্ পয়গাম পাঠালেন মির্যা মাজহার জান-ই জানাঁর খিদমতে, —"জনাব, অধমকে কখনো সুযোগ দিচ্ছেন না। দু'একবার সুযোগ দিয়ে কোন কিছু হুকুম করে অধমকে ধন্য হওয়ার অবকাশ দিন।" পয়গামের সাথে হাদিয়া পাঠালেন (সে যুগের) সহস্র মুদ্রা। আল্লাহ্-প্রেমিক জওয়াব দিলেন, "দেখুন, আল্লাহ্ পাকের ইরশাদ রয়েছে قل متاع الدنيا قليل 'বলুন (হে নবী)! পৃথিবীর ভোগ্যপণ্য নগণ্য।' সে পৃথিবীর অন্যতম

মহাদেশ এশিয়ার অংশ-বিশেষ হচ্ছে হিন্দুস্তান, আর হিন্দুস্তানের সামান্য অংশ রয়েছে আপনার অধিকারে। তার কিয়দংশ আমি নেওয়ার অর্থ হল আপনার সামান্যতম অংশে ভাগ বসানো। আমি তা করতে পারি না।" এটা ছিল তাঁর মনের কথা আর এ ধরনের ঘটনা বিরল নয়। বোরহানপুরে বাস করতেন জনৈক বুযুর্গ। বাদশাহ আলমগীর তাঁর দরবারে যেতে শুরু করলেন। বুযুর্গ (বিনয়ের সাথে) বললেন—সামান্য একটু জায়গা আমি পছন্দ করছিলাম, তা' যদি জনাবের পসন্দ হয়ে থাকে, তাহলে অন্য কোথাও চলে যাই। একটি আক্ষেপের বিষয় এই যে, বুযুর্গানের জীবনচরিত সংকলিত হয়নি যথাযথভাবে। শরীয়ত পালনে তাঁদের নিষ্ঠা, সুন্নত অনুসরণে তাঁদের উদ্দীপনা, তাঁদের রাত জেগে 'ইবাদত, কুরআন-হাদীছের সাথে তাঁদের গভীর আত্মিক যোগ ও প্রেম, এ সব রয়েছে অনুল্লিখিত। এখানে 'তারীখে গুজরাট'-এর গ্রন্থকারের মন্তব্য উল্লেখ্য—"যে কোন বুযুর্গের জীবনী পড়লে মনে হবে যেন প্রাকৃতিক নিয়ম ভেঙে ফেলাই ছিল তাঁর প্রিয় কাজ। (মূল) ধাতু চতুষ্টয়—আগুন, পানি, মাটি ও বাতাসে কারামতি দেখানোই যেন ছিল তাঁদের জীবন সাধনা। কাউকে মেরে ফেলা, জীবিতকে মৃত্যু দান, মৃতকে জীবন দান, নিমজ্জমান নৌকা কিংবা জাহাজকে অংগুলি সংকেতে রক্ষা করা, এ সব তাঁদের জীবনালেখ্য। তাঁদের জীবনেতিহাস সংকলন পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত ভ্রান্তিপূর্ণ। বাস্তবে তাঁরা ছিলেন অনেক 'ইল্‌ম ও 'আমলের অধিকারী। অবশ্য এমন হতে পারে, যথাযথভাবে হাদীছ তাঁদের কাছে না পৌঁছার ফলে কিংবা সরাসরি হাদীছের 'ইল্‌মের স্বল্পতার কারণে কখনো তাঁদের ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে, কিন্তু সাধারণত তাঁরা ছিলেন আহ্‌লে 'ইল্‌ম এবং 'ইল্‌মের মানদণ্ডে পরখ না করে কাউকে বুযুর্গের মসনদে তাঁরা আসীন করেন নি।"

আমি আয়াত তিলাওয়াত করেছিলাম— هو الذي بعث ... ... والحكمة, "তিনিই সেই মহান সত্তা (আল্লাহ্) যিনি নিরক্ষর (উম্মীদের) মাঝে পাঠালেন তাদের মধ্যে হ'তে একজন রাসূল, যিনি তাঁদের (১) তিলাওয়াত করে শোনান তাঁর বাণীসমূহ, (২) সংশোধন করেন তাদের চরিত্র, (৩) শিক্ষা দেন তাদের কিতাব ও (৪) হিকমত।"

এ হচ্ছে নবুওতের চার বিভাগ।

আল্লাহ্ নায়েবে নবীগণকে এ দায়িত্ব অর্পণ করেন উত্তর সুরি ও প্রতি-নিধিরূপে। তিলাওয়াতের নমুনা আজকের মজলিসের শুরুতে আপনারা

দেখেছেন। ক্বারী সাহেবান আজও পড়েছেন, প্রতিটি জায়গায় তাঁরা তিলাও-য়াত করে থাকেন। মাদরাসাগুলোতে ব্যবস্থা রয়েছে হিফ্‌জ ও তাজ্‌বীদের। ইন্‌শাআল্লাহ্‌ তা বিদ্যমান থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। কারণ আল-কুরআন ঘোষণা করেছে—انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون "আমিই নাযিল করেছি উপদেশমালা (কুরআন) আর আমিই হচ্ছি অবশ্যই উহার সংরক্ষক।" কোন কোন আয়াতে রয়েছে—يتلوا عليهم ايته و يعلمهم الكتاب অর্থাৎ কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দানের কথা আগে বলা হয়েছে। তা হচ্ছে আয়াতের পূর্বাপর সংযোগ ও বর্ণনা-শৈলীর ব্যাপার। তার রহস্য বলতে পারেন কুরআনে সুগভীর প্রজ্ঞা-সম্পন্ন বিদ্বানেরা। কেননা তার সম্পর্ক রয়েছে সূরার মৌলিক আলোচ্য বিষয় ও অবতরণ পটভূমির সাথে। আমাদের কর্তব্য হল কাজ করে যাওয়া। তা হচ্ছে কিতাবের তা'লীম, দীনী 'ইল্‌মসমূহ ও কুরআন-হাদীছ এবং তফসীরের জ্ঞান অর্জন ও বিতরণ করা।

হিকমত অর্থ নৈতিকতা

পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হিকমত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে উত্তম নৈতিক গুণ (সমূহ)। আমাদের উস্তাদ এবং তাঁর যুগের বিশেষজ্ঞ আলিম মাওলানা সায়্যিদ সুলায়মান নদভী (র)-র গবেষণা মতে পবিত্র কুরআনের যত স্থানে 'হিকমত' শব্দ উল্লিখিত হয়েছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে নৈতিকতা। و لقد اتينا لقمان الحكمة "আমি অবশ্যই লুকমানকে হিকমত দান করেছিলাম।" এ আয়াতের পরবর্তীতে উল্লিখিত বিষয়সমূহ শুধু নৈতিকতা ও চরিত্র বিষয়ক। হিকমত শব্দের উল্লেখের পরে বিবৃত প্রকরণসমূহ চরিত্র সংশ্লিষ্ট বিষয়। অনুরূপ সূরা "ইসরাতে" চারিত্রিক বিষয়সমূহের বিবরণ দেওয়ার পর ইরশাদ হয়েছেঃ ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمة "(হে নবী!) এসব হচ্ছে আপনার কাছে ওয়াহীকৃত মহাজ্ঞান।" এখানেও উত্তম চারিত্রিক বিষয়াবলীর পরে 'হিকমত' শব্দ উল্লিখিত হয়েছে। কাজেই হিকমত মানে আখলাক, চরিত্র, উত্তম নৈতিক গুণাবলী।

তাযকিয়া ব্যতিরেকে কিতাব ও হিকমতের তা'লীম অসম্পূর্ণ

আয়াতে বর্ণিত পরবর্তী বিষয় হচ্ছে 'তায্‌কিয়া' (পবিত্রকরণ ও সংশোধন)। তার উদ্দেশ্যে হচ্ছে কুৎসিত অভ্যাস, কলুষতা ও মন্দ চরিত্রগুলো

বিদূরিত করা। হিংসা-বিদ্বেষ, ক্রোধ, দুনিয়ার মহব্বত ও মর্যাদার মোহ দূর করে দিয়ে আল্লাহ্‌র মহব্বত, আখিরাত ও জান্নাতের বাসনা অন্তরে বদ্ধমূল করা। যে কোন জামেয়া বা দারু'ল-'উলূম হোক, তার লক্ষ্য হবে এমন শিক্ষিত সমাজ গড়ে তোলা যাঁরা দায়িত্ব পালন করবেন তিলাওয়াত, কিতাব ও হিকমতের তা'লীম এবং তাযকিয়ার। তাযকিয়া ব্যতীত অন্যগুলি অপূর্ণাঙ্গ থেকে যায়। আমাদের 'আলিম সমাজ প্রবৃত্তির গোলামী থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছেন। এখন তাঁদের কর্তব্য হবে এ দিকে লক্ষ্য রাখা যে, সম্পদ ও মর্যাদার যে কোন বিশাল ও বিপুল পরিমাণও যেন তাদের বিচ্যুত না করতে পারে তাদের নীতিবোধ, তাঁদের জাতীয় কর্তব্য, তাঁদের জীবন মান এবং জীবনের বিশেষ লক্ষ্য থেকে। আরব-আজমে অভাব নেই আজ কোন কিছুর। অভাব যদি থেকে থাকে, তবে তা হচ্ছে কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ ও অল্পে তুষ্টির জীবন যাপনের। মানুষ যে জিনিসের অভাবী তা যেখানে পাওয়া যাবে সে দিকে সে আকৃষ্ট হবে—এটাই বিধান। আমি অভাবী হলে অন্যের প্রাচুর্যে প্রভাবিত হব। কিন্তু আমার প্রয়োজনীয় বস্তু যদি আমার হাতে থাকে (তাতে উনিশ-বিশের ব্যবধান থাকুক না কেন) তাহলে আমি মাথা নত করব না কোথাও, মার খাব না কারো হাতে। আজকের বস্তুবাদ পীড়িত লোকেরা আলিমদের কাছে আসে, কিন্তু সেখানে তারা হতাশ হয়। কোন ব্যবধান দেখতে পায় না। আলিমদের ব্যক্তি জীবন, ঘর-সংসার, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন দেখে, জীবন যাপনের জাঁকজমক দেখে তারা প্রভাবিত হয় না, বরং বেড়ে যায় তাদের কুধারণা।

পাকিস্তানে আজ তৈরী হোক এমন 'আলিম সমাজ যারা বাস্তব বিচারে হবেন ... يتلوا ايته ...-র বাস্তব দৃষ্টান্ত, নববী সীরাতের বাহক। হাদীছ পাকে রয়েছে—... ان الانبياء لم يورثوا دينارا و لا درهما নবীগণ দীনার, দিরহাম (স্বর্ণমুদ্রা-রৌপ্যমুদ্রা) মীরাছরূপে রেখে যান নি। তাঁরা রেখে গিয়েছেন দীনের এই মহান 'ইল্‌ম ভাণ্ডার। এ যুগের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ভোগবাদ, বস্তুবাদ আর তার জওয়াব হচ্ছে ভোগ ও বস্তু থেকে উর্ধ্বে, উন্নত ক্ষেত্রে অবস্থান করে এ কথার প্রমাণ পেশ করা যে, বস্তু আমাদের প্রভাবিত করতে পারে না, আমরা হতে পারি না তার গোলাম। আমি কখনো একথা বলছি না যে, উত্তম পবিত্র জিনিসগুলো আমরা বর্জন করব, নিজেদের জন্য তা হারাম ঘোষণা করব। কারণ আয়াতে রয়েছে قل من حرم زينة الله التى اخرج لعباده و الطيبات من الرزق

"জিজ্ঞাসা করুন কে হারাম করল আল্লাহ্‌র দেয়া সৌন্দর্য (উত্তম পোশাক)-সমূহ, যা তিনি উৎপাদন করেছেন তাঁর বান্দাদের জন্য এবং কে নিষিদ্ধ করল উত্তম খাবারগুলি?" খোদ নবী 'আলায়হি'স-সালামকে সতর্ক করা হচ্ছে—يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك "হে নবী! কেন হারাম করছেন তা, যা আল্লাহ্ হালাল করে দিয়েছেন আপনার জন্য?" হযরত (স.)-কেই যখন এমন বলা হল তাহলে আমরা কোন্ হিসাবের খাতায় রয়েছি? বৈধ বিষয়বস্তু তথা আল্লাহ্‌র নিয়ামত আমরা পুরোপুরি ভোগ করব। সুস্বাদু খাবারের তওফীক থাকলে ইচ্ছাকৃতভাবে তা বিস্বাদ করতে যাব কেন? কোন কোন অতি দরবেশ সম্পর্কে শুনেছি, বিস্বাদ করার জন্য (প্রতিবেশীকে কোন হাদিয়া পাঠাবার জন্য নয়) তরকারিতে পানি ঢেলে দিতেন, কেউ নিমক বেশী করে দিতেন, কেউবা মোটেই দিতেন না। উদ্দেশ্য বিস্বাদ করা। এসব ইসলাম নির্দেশিত তায্‌কিয়া' নয়, শরীয়ত দেয়নি এ ধরনের কর্মের প্রেরণা। মধ্যম ধরনের সুস্বাদু খাবার পেলে আপনি অবশ্য আল্লাহ্‌র শোক্‌র আদায় করবেন প্রতি গ্রাসে গ্রাসে। পরিমিত ভোগের অনুমতি রয়েছে, কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে هل من مزيد "আরো চাই, আরো চাই" শ্লোগান যেন জঠর থেকে না ওঠে। এমন তীব্র লালসা না হয় যে, সম্পদ ও মর্যাদার কোনও পরিমাণ তা দমাতে পারে না, লালসা ও কামনাকে করতে পারে না শান্ত। আলিম সমাজকে হতে হবে এমন কলুষতা থেকে পবিত্র।

প্রয়োজন ক'জন দরবেশ প্রকৃতির মনীষীর

আজ পাকিস্তানকে রক্ষার জন্য যে সব বিষয়ের প্রয়োজন—যার কথা আমি আলোচনা করে আসছি করাচী ইসলামাবাদ থেকে এই ফয়সালাবাদ পর্যন্ত—সেগুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং একটি বড় শক্তি হল আলিম সমাজের আড়ম্বরবিহীন, অল্পে তুষ্টি ও আত্মমর্যাদায় উদ্বুদ্ধ জীবন। তাঁরা পেশ করবেন এমন জীবনের দৃষ্টান্ত, যাতে প্রতিবিম্বিত হবে তাঁদের স্বাতন্ত্র্য, প্রমাণিত হবে যে, তাঁরা "ওয়ারাছাতু'ল-আম্বিয়া"—নবীগণের উত্তরসুরি ও স্থলাভিষিক্ত। তাঁরা বস্তুবাদের বলি নন, বস্তুবাদ তাদের ঘায়েল করতে পারেনি যাঁদের সান্নিধ্যে প্রকাশ পাবে পৃথিবীর কৃত্রিমতা কিংবা "বস্তু ও সম্পদই সব কিছু নয়" অন্তত এ সত্য তাঁদের নীতি হবে। প্রয়োজন থাকলে কেউ আসতে পারে এখানে শতবার, আমরা যাচ্ছি না কারো

দুয়ারে।" যদি যাই কখনো তবে তা হবে দীনের দা'ওয়াত, সত্য ও ন্যায়ের আদেশ, অন্যায়-অসত্যের নিষেধাজ্ঞা পৌঁছাবার জন্য, কোন ফরয কিংবা সুন্নাহর পুনরুজ্জীবন উদ্দেশ্যে—ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধি কিংবা সুপারিশ করার উদ্দেশ্যে নয়। এ শূন্যতা পূরণ করতে পারে না অন্য কিছু। পাকিস্তানের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন এটাই। কেননা এ শূন্যতা অন্য কিছু দ্বারা পূরণ করা যাবে না। রচনা ও সংকলন, বক্তৃতা ও ভাষণ তথা লিখনী ও বাগ্মিতা এবং গবেষণা ও রাজনীতি কোন কিছুই এর স্থান দখল করতে পারে না। এমন কতক লোক তো থাকা দরকার, যাঁদের কাছে ধরনা দেবে শক্তিধর ও ক্ষমতাসীনরা, রাজনীতিক ও দেশনায়কেরা এবং সেখানে পাবে তাদের বেদনার উপশম, তারা অনুভব করবে আল্লাহ্‌র বিশিষ্ট বান্দাদের যথার্থতা এবং নিজেদের অযোগ্যতা ও অপদার্থতা। একবার আমি বলেছিলাম, 'তাযকিয়া' ও 'ইহ্‌সান' (সংশোধন ও সদাচার) আপনাদের দৃষ্টিতে যদি অপ্রয়োজনীয় হয়, তা হলে স্থলবর্তী কার্যক্রম কিছু আবিষ্কার করুন অর্থাৎ এমন কিছু যেখানে লোকেরা অনুভব করবে তাদের চারিত্রিক দুর্বলতা, মনুষ্যত্বের অবনতি ও আত্মিক রোগ-ব্যাধি। যেখানে উপস্থিত হয়ে মানুষ খুঁজে পাবে এক নতুন শক্তি, নতুন উদ্দীপনা। সে বক্তব্যের সমাপনীতে আমি আবৃত্তি করেছিলাম আরব কবি হুতাইয়ার পংক্তি——

أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم
أو سدوا المكان الذي سدوا

"পূর্বসূরীদের এবং অনুসরণীয়দের অনেক তিরস্কার গালাগালি করেছ। এখন একটু থাম, জিহ্‌বা নিবৃত্ত কর। যোগ্যতা থাকলে পূর্ণ কর তাদের শূন্যস্থান।" আপনারা কোন চিকিৎসকের 'আরোগ্য নিকেতন' বন্ধ করে দিচ্ছেন। খোদার দোহাই! তার চেয়ে উন্নতমানের কোন ডাক্তারখানা (হাসপাতাল) প্রতিষ্ঠা করুন। একটি বন্ধ করে তার স্থলে আর একটি প্রতিষ্ঠা তো করবেন না, বরং তার বদলে করবেন মুসাফিরখানা, সরাইখানা কিংবা কুতুবখানা। পাঠাগার প্রতিষ্ঠা উত্তম কাজ, কিন্তু তা স্থলবর্তী হতে পারে না হাসপাতালের। হাসপাতালের বদলে চাই হাসপাতাল, চিকিৎসকের স্থানে চাই অন্য চিকিৎসকই। যুগের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে 'বস্তুবাদ', তার জওয়াব হচ্ছে বাস্তবসম্মত, বিশুদ্ধ সুন্নাহ্ সমর্থিত অধ্যাত্মবাদ, তায্‌কিয়া (সংস্কার)—যা হবে শরীয়ত পরিপন্থী কর্ম ও পন্থা থেকে পবিত্র।

তাতে এমন কোন কিছু থাকবে না, যার সমর্থন করে না কুরআন ও সুন্নাহ্, যার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না নববী ও সাহাবী যুগে। এ কাজের বাহকগণ হবেন একদিকে গভীর 'ইল্‌মসম্পন্ন, অপরদিকে দীনদারিতে অবিচল ও নিষ্ঠাবান। আজ এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ্ পাক আমাদের ও আপনাদের এ পথে চলার তৌফিক দিন---ওয়া আখিরু দা'ওয়ানা 'আনিল হ'ামদু লিল্লাহি রাব্বি'ল-'আলামীন।

الحمد لله نحمده و نستعينه ... ... الله يجتبي
اليه من يشاء و يهدي اليه من ينيب -

কুরআন অধ্যয়ন ও এর আদবসমূহ

(২৬ শে জুলাই ৭৮ইং মডেল টাউন, লাহোরের কুরআন একাডেমীর এক বিশেষ জলসায় এ বক্তৃতা দেয়া হয়েছিল। এ জলসায় দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে এসেছিলেন চিন্তাশীল কুরআন অধ্যেতাগণ। বিশেষ বক্তব্য এবং কুরআন একাডেমীর পরিচিতি পেশ করেন একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ডক্‌টর আসরার আহ্‌মদ।)

পবিত্র কুরআন সর্বক্ষেত্রেই সহায়ক ও সমাধান

প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ! কিয়ামত পর্যন্ত চলমান আল-কুরআনের মু'জিযা-সমূহের অন্যতম হল সর্বক্ষেত্রে তার সহায়তা ও সমাধান প্রদানের উপযোগিতা। আমার জীবনে এ অভিজ্ঞতা বহুবার হয়েছে যে, বক্তৃতার প্রারম্ভে আমি বিষয় নির্ধারণের অস্থিরতা এবং কথা শুরু করার অনিশ্চয়তায় ভুগছিলাম---ইতিমধ্যে ক্বারী সাহেব কোন আয়াত তিলাওয়াত শুরু করলেন এবং আমার মনে হতে লাগল, শ্রোতাদের শোনার আগে আমারই জন্য এ আয়াতসমূহ চয়ন করা হয়েছে। বিদেশ ভ্রমণেও আমার অভিজ্ঞতা অনুরূপ। সারাদিনের ব্যস্ততা ও বিভিন্ন প্রোগ্রামের কারণে বক্তৃতার বিষয়বস্তু নিয়ে ভাবনা করার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। অনুষ্ঠানে পেঁৗছে কোথাও নির্ধারিত বিষয়ের উপরে আলোচনা করতে হত, কোথাও বা অনির্ধারিত (মুক্ত) বিষয়ে। আমি বিষয়টি আল্লাহ্‌র হাওয়ালা করে রাখতাম এই ভরসায় যে, তিনি যথাসময়ে উপায় করে দেবেন। যেহেতু আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের ভাষায় তাঁর পক্ষ থেকে আগত বিষয়কে বলা হয় 'ওয়ারিদ'—(আগন্তুক বা স্বাগত)। সম্মানিত মেহমান যিনি নিজের ইচ্ছায় এসেছেন, মেযবানের ইচ্ছা বা নির্বাচন যেখানে

কার্যকরী নয়। আজকের ব্যাপারও ছিল অভিন্ন। আল্লাহ্ পাক আজকের মজলিসের ক্বারী সাহেবকে জাযায়ে খায়ের দান করুন, যিনি এ আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করলেন। আমি পথ পেয়ে গেলাম। আয়াতসমূহের তাফসীর সম্পর্কে এবং আমার আসল শ্রোতা কুরআন পাকের তালিব 'ইল্মদের কাছে কিছু অভিজ্ঞতা ও পরামর্শের কথা পেশ করার আগে আমি আমার নগণ্য ব্যক্তি-পরিচিতি এবং আমার 'ইল্মী সফর সম্পর্কে কিছু কথা পেশ করতে চাই।

পবিত্র কুরআনে দাওয়াতের হিকমত

ডক্টর সাহেব বেশ আড়ম্বরের সাথে আমারও পরিচিতি পেশ করেছেন। কিন্তু আরো কিছুটা পরিচয় পেশ করার প্রয়োজন অনুভব করছি এবং হযরত ইউসুফ 'আলায়হি'স-সালামের সুন্নত অনুসরণ করে নিজেই আনজাম দিচ্ছি সে কর্তব্য। স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে আসা লোকদের হযরত ইউসুফ (আ) বলেছিলেন----- ذالكما مما علمني "স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আমাকে শেখানো বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত।" তাঁর এ আত্মপরিচিতি প্রদানের কারণ কি ছিল? শ্রোতা কিংবা প্রশ্নকর্তার মনে সর্বাগ্রে এ নিশ্চয়তা সৃষ্টি করতে হবে যে, তাদের সম্মুখস্থ ব্যক্তির দ্বারা সহায়তা লাভ করা যেতে পারে। ব্যক্তি নির্বাচনে তারা ভ্রান্তির শিকার হয়নি। তাই তিনি বলেছিলেন---স্বপ্ন ব্যাখ্যা আমার প্রতিপালকপ্রদত্ত জ্ঞান। কেননা

إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وبالآخرة هم كافرون -

আমি বর্জন করেছি এমন সব লোকদের মাযহাব যারা ঈমান রাখে না আল্লাহ্‌র একত্ববাদে এবং অস্বীকার করে আখিরাতকে। (সূরা ইউসুফ)

এ ছিল একজন নবীর কথা, "তোমাদের পরবর্তী খাদ্য গ্রহণ সময়ের আগেই আমি তোমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা পেশ করছি।"------- এতে ছিল কিঞ্চিৎ আত্মস্তুতির প্রকাশ। সম্ভাব্য সে ধারণা খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে সাথে সাথে তিনি বললেন---ذالكما مما علمني ربي "ঐ বিষয়টি আমার জন্য আমার প্রতিপালক প্রদত্ত 'ইল্ম।" অর্থাৎ তোমাদের সমস্যা সমাধানে আমি তোমাদের সহায়তা করতে পারছি। কেননা আল্লাহ্ আমাকে সে 'ইল্ম

দান করেছেন। কিন্তু কেন দান করলেন তিনি? কেননা---إني تركت ملة قوم আমি বর্জন করেছি----- অর্থাৎ তা আমার মেধা কিংবা অভিজ্ঞতার ফসল নয় (অথচ তাঁর মাঝে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল এ উভয় গুণ); বরং এ 'ইল্ম লব্ধ হয়েছে এ কারণে যে, আমি বর্জন করেছি আল্লাহ্ এবং আখিরাতে অবিশ্বাসী জাতিকে আর সেই সাথে واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب "আমি অনুসরণ করেছি আমার পূর্বসূরী ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের মাযহাব।" এভাবে তিনি অবকাশ সৃষ্টি করেছিলেন তওহীদের ওজর করার। প্রিয় ভাইয়েরা! যে বিষয়টি তোমাদের কাছে সুকঠিন এবং যে ভারী বিষয়টি নিয়ে তোমাদের আগমন, আমাদের সবার সামনে রয়েছে তার তুলনায় কঠিনতর সমস্যা। তা হচ্ছে আকীদা ও মৌল বিশ্বাসের সমস্যা। তোমরা যে স্বপ্ন দেখেছ (আর স্বপ্ন অবশেষে স্বপ্নই) সে তো ঘুমের জগতের ব্যাপার। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সজাগ পৃথিবীর, সমস্যা হচ্ছে ভবিষ্যত জীবন, স্থায়ী ও চিরন্তন জীবনের।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারে এমন একটি লোকও যদি খুঁজে না পাওয়া যায় তবে তা কোন মারাত্মক ক্ষতির কারণ নয়; কিন্তু এ বাস্তব স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারে এমন কাউকে পাওয়া গেল না, হদিস দিতে পারল না কেউ, পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্য কি? পরিচয় দিল না কেউ বিশ্বস্রষ্টার, মূল বিপদাশংকা রয়েছে এসব বিষয়ে জ্ঞান লাভ না করার ক্ষেত্রে। কিন্তু তিনি এই সংক্ষিপ্ত ডোজ (Dose) দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছিলেন। কেননা তিনি বুঝতেন যে, আগন্তুকরা এসেছে পেরেশান হয়ে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে, দু'চার ঘণ্টার লম্বা ওয়াজ শোনার ধৈর্য তাদের হবে না। তাই তিনি একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক---একজন প্রজ্ঞাসম্পন্ন ধর্মপ্রচারক এবং সংস্কারকের ন্যায় যথার্থ পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়ে ডোজ ততটুকুই দিয়েছেন যা ছিল তাদের সহনশীলতার পরিধিভুক্ত।

কখনো কখনো মনের দুয়ার খুলে যায়

লক্ষ্য করুন পরিমিতিবোধের দিকে, তাতে পরিপূর্ণ পরিস্ফুটিত রয়েছে 'ইউসুফী সৌন্দর্যবোধ'। অল্প ও অধিকের মাঝে পরিমাপ ঠিক রেখে তিনি যথাস্থানে থেমে গিয়েছেন অর্থাৎ তওহীদের মূল কথাটি বলে দিলেন। কিন্তু এত দীর্ঘ করলেন না যাতে লোকেরা বিরক্ত হয়ে বলে ফেলে, 'জনাব! আপনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারেন তো দিন, অন্যথায় আমরা অবসর

সময়ে আসব।' হযরত ইউসুফ (আ) দেখলেন, তাদের মন ও মস্তিষ্কের দরজা খোলা রয়েছে আর মনের দুয়ার খুলে মাঝে মধ্যে, যখন ভাগ্য হয় সুপ্রসন্ন, মনের দরজা উন্মুক্ত হয় বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে, কোন দুশ্চিন্তার সময়ে, এমন সুবর্ণ সুযোগে উন্মুক্ত দরজা পথে পোঁছে দিতে হয় মূল পয়গাম। তবে তা করতে হবে দ্রুততর কৌশলের সাথে দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগেই এবং 'প্রত্যাখ্যানে' বন্ধ হওয়ার পূর্বেই। বিষয়টি উপলব্ধি করে আমি বিস্ময়াভিভূত হয়ে যাই। সেই সাথে আমার আক্ষেপ যে, বাইবেলে এ অংশটি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। আর এতেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বাইবেল কার রচনা আর কুরআন কে অবতীর্ণ করেছেন?

হযরত ইউসুফ (আ) ভালভাবেই জানতেন, তাঁর শ্রোতারা কতটুকু সহ্য করতে পারবে? তিনি ততটুকুই বলেছিলেন। রোগী চায় দ্রুত তার রোগের প্রতিকার। এজন্যই তিনি আশ্বাস-বাণী শোনালেন قبل ان يأتيكما অর্থাৎ বরাদ্দ রেশন পাওয়ার সময়ের পূর্বেই ব্যাখ্যা দিচ্ছি। চিকিৎসকের কাছে আগন্তুক রোগী নিশ্চয়তা চায় দু'টি বিষয়ে—ওষুধ পাওয়া যাবে কি না এবং তা দ্রুত পাওয়া যাবে কি না? মাঝে তিনি পেশ করলেন তওহীদের পয়গাম।

কুরআন অধ্যয়নের মাধ্যমে 'ইল্‌মী জীবনের সূচনা

এখন আমি কিঞ্চিৎ আত্মপরিচয় পেশ করা উপযোগী মনে করছি। আমি পবিত্র কুরআনের একজন অতি নগণ্য ও তুচ্ছ তালিব 'ইল্‌ম। আমার 'ইল্‌মী জীবন শুরু হয়েছে কুরআন অধ্যয়নের মাধ্যমে। আমি কয়েক স্থানে লিখেছি আল্লাহ্ আমাকে তওফীক দিয়েছিলেন এমন একজন উস্‌তাদের সান্নিধ্যে আসার, যিনি ঈমানী ও কুরআনী রুচির অধিকারী।[১] তিনি কুরআন তিলাওয়াত করতেন আর কাঁদতে থাকতেন। আমার মনে প্রথম রেখা অংকিত হয়েছিল তাঁর বেদনাভরা উচ্চারণের। তাই ছিল আমার সৌভাগ্য, এটাই পবিত্র কুরআনের মূল স্বভাব।

পবিত্র কুরআনের স্বভাব হচ্ছে 'সিদ্দীকী'

কুরআন শরীফ 'সিদ্দীকী' স্বভাবের বিষয়।[২] হুযূর সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পূর্বে তাঁর মুসল্লায় দাঁড়িয়ে হযরত আবূ বকর

১. শায়খ খলীল বিন মুহাম্মদ ইয়ামানী (র)।
২. দ্বিধাহীন ও প্রশ্নবিহীন চিত্তে যাঁরা নবীকে সত্যবাদী মেনে নেন তাঁদের বলা হয় 'সিদ্দীক' অর্থাৎ নির্দ্বিধ সত্যগ্রাহী। এঁদের স্বভাব হল সিদ্দীকী স্বভাব।

সিদ্দীক (রা)-কে নামাযে ইমামতি করার নির্দেশ দেয়া হল। হযরত 'আয়েশা (রা) 'আরজ করলেন, আবূ বকরকে রেহাই দেয়া হোক। তিনি 'অতি ক্রন্দনশীল' মানুষ, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে আরম্ভ করলে প্রবল কান্না তাঁর তিলাওয়াত থামিয়ে দেবে। মুক্তাদীরা শুনতে পাবে না। মুশরিকদেরও অভিযোগ ছিল অভিন্ন। হযরত আবূ বকর (রা)-কে তাঁর বাড়ীতে নামায পড়ার অনুমতি দেয়া হলে তিনি তাঁর বাড়ীর সম্মুখভাগে একখানা মসজিদ বানালেন। নীরবে নামায পড়া পর্যন্ত কোন অসুবিধা ছিল না। কিন্তু শব্দ করে তিলাওয়াত শুরু করলে সেখানে ভিড় জমে যেত শিশু ও নারী-পুরুষের। তাঁর মর্মবেদনাপূর্ণ তিলাওয়াতে পাথরও গলে যেত, শ্রোতাদের মনে তা এমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করত যার ফলে কুরায়শদের দুশ্চিন্তা হল মক্কায় কোন বিপ্লব ঘটে যাওয়ার। তারা ভাবনায় পড়ল পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না যায়।

মূলত কুরআনের স্বভাবই হচ্ছে দিলের দরদ লাগিয়ে ঈমানী আস্বাদনের সাথে তিলাওয়াত করা। হাদীছ শরীফে রয়েছে ঃ

الايمان يمان و الفقه يمان و الحكمة يمانية

ঈমান হচ্ছে য়ামানের, ফিকাহ্ য়ামানের আর হিকমতও য়ামানী।

আমার সৌভাগ্য, আমার প্রথম মু'আল্লিম ছিলেন কোমল হৃদয়, দরদে ভরা মনের অধিকারী। আমাদের আক্ষেপ হত—যখন তিনি তিলাওয়াত করতেন—তিনি তিলাওয়াত করতে থাকুন, আর আমরা শুনতে থাকি। তিনি আমাদের মহল্লার মসজিদে ফজরের নামাযে ইমামতি করতেন। খুব কমই তিনি পূর্ণ সূরা তিলাওয়াত করতে পারতেন। তিলাওয়াত শুরু করার পরই প্রবল বেগে কান্না চেপে আসত, আওয়াজ ডুবে যেত। রোজই এমন হত। তিনিই আমাকে পবিত্র কুরআনের কয়েকটি সূরা পড়িয়েছেন। শুরু করেছিলেন তওহীদের আলোচনাসম্বলিত সূরাসমূহ দিয়ে। প্রথম সূরা ছিল 'যুমার'। পরবর্তী সময়ে ভাষা ও সাহিত্য বিষয় লেখাপড়ার চাপ সৃষ্টি হলে তাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম, কিন্তু পবিত্র কুরআনের প্রতি আকর্ষণ দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকল। এর রুচিবোধ আমাকে প্রভাবিত করত।

শিক্ষা জীবন সমাপ্ত হলে আমার কুরআন অধ্যয়নের আগ্রহ আরো বৃদ্ধি পেল। মাদ্‌রাসা নিসাবের তালিকাবহির্ভূত অনেক কিতাব পড়লাম। এই

লাহোরে এসে পুরো কুরআন পড়লাম মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরী (র)-এর কাছে। এখানেও পেলাম তাঁর কুরআনী জীবন, তাঁকে বলা হত "চলমান কুরআন"। অন্তরে অনুভূত হত তাতে এক অনাবিল পরিচ্ছন্নতা। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে তাঁর আড়ম্বরহীনতা, দরবেশসুলভ জীবন যাপন এবং তাঁর সুন্নতের আমল আমাকে এমন প্রভাবিত করেছে যাকে ব্যক্ত করা হয় 'বরকত' শব্দ দিয়ে। কিছুদিন দারু'ল-'উলুম দেওবন্দেও কুরআন শেখার সুযোগ হয়েছে। মাওলানা সায়্যিদ হুসায়ন আহমদ মাদানী (র)-র খেদমতে আরজ করলাম, আমাকে একটু সময় দিন, যাতে পবিত্র কুরআনের কঠিন আয়াতসমূহ যা প্রচলিত তাফসীর গ্রন্থে আমি আত্মস্থ করতে পারিনি তা আপনার খেদমতে পেশ করে বুঝে নিতে পারি। মাওলানা ছিলেন তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ আলিমগণের অন্যতম। বিভিন্ন বিষয় এবং হাদীছ (তিনি ছিলেন যার স্বীকৃত উস্তাদ ও শায়খুল হাদীছ) ছাড়াও কুরআন শরীফে তাঁর ছিল গভীর প্রজ্ঞা, তাঁর জীবন ও স্বভাব ছিল কুরআনী রঙে রঙিন। তিনি আমাকে সময় দিয়েছিলেন শুক্রবারে। আমার মনে পড়ে কঠিন আয়াতগুলি আগে থেকে খুঁজে বের করে যথাসময়ে তাঁর সামনে পেশ করতাম। তাঁকে খুব বেশী সফর করতে হত। সময়টি ছিল খিলাফত আন্দোলনের—তবুও আমি সুযোগ পেয়েছিলাম তাঁর নিকট থেকে কিছু 'ইলম হাসিল করার।

মাওলানা সায়্যিদ সুলায়মান নদভীর কুরআন প্রজ্ঞা

নিকট অতীতের শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ মাওলানা সায়্যিদ সুলায়মান নদভী (র)-এর তাফসীর এবং বিভিন্ন আয়াত সম্পর্কে তাঁর সারগর্ভ আলোচনা শোনার অবকাশ আমার হয়েছে। আমি তো কুরআন অনুধাবনে কারো জ্ঞান, গভীরতা তাঁর সাথে তুলনীয় পাই নি। আমার এ দাবী একটা ঐতিহাসিক তথ্য। কেননা লোকেরা সায়্যিদ সুলায়মান নদভীকে মনে করে ইতিহাসবেত্তা কিংবা চরিত-রচয়িতা কিংবা কালামশাস্ত্রবিদ।[১] কিন্তু আমার মতে কুরআনের উপলব্ধিতে তাঁর স্তর এত উঁচুতে যে, কুরআন অধ্যয়নের প্রসারতা ও গভীরতায় গোটা উপমহাদেশে কেউ তাঁর স্তরে উপনীত হতে পারেনি। তাঁর এ সুগভীর প্রজ্ঞার মূলে ছিল আরবী ভাষা ও সাহিত্য এবং বালাগাত ও ই'জায (অলংকরণ ও বর্ণনাশৈলীতে কুরআনের সর্বকালীন চ্যালেঞ্জের উর্ধ্বে অবস্থান ও সর্বব্যাপী শ্রেষ্ঠত্ব) বিষয়ে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য। তা ছাড়া তিনি

১. ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহের আলোচক শাস্ত্র হল 'ইলমু'ল-কালাম'।

মাওলানা হামীদুদ্দীন ফারাহী (র)—যিনি ছিলেন এ বিষয়ে ইমাম ও বিশেষজ্ঞ—এর সান্নিধ্য, তাঁর আলাপচারিতা এবং তাঁর গবেষণা ও কুরআন অধ্যয়নের নির্যাস গ্রহণ করেছিলেন। আমার আজও মনে পড়ে, একবার দারু'ল-মুসান্নিফীনে ('আজমগড়) আমরা সূরা জুম'আর উপর তাঁর বক্তৃতা শুনেছিলাম। এমন পাণ্ডিত্যসুলভ গবেষণা ও সূক্ষ্ম আলোচনাসমৃদ্ধ বক্তৃতা আর কখনো শুনিনি। হায়, তা যদি সংরক্ষিত হয়ে থাকত! মোটকথা, এ মহান ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে আমি কুরআন অধ্যয়নে উপকৃত হয়েছি।

তারপর আসে দারু'ল-'উলুম নাদওয়াতু'ল-'উলামা' (শিক্ষাঙ্গনে) আমার উস্তাদরূপে কুরআন অধ্যয়নের পালা। সেখানে বিশেষভাবে কুরআন পাঠনের দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়েছিল আমাকে। প্রসংগত উল্লেখ্য, নদওয়াতু'ল-'উলামা'য় কুরআন শিক্ষা দু'টি স্তরে বিভক্ত। প্রথমত, তাফসীর-বিহীন মূল কুরআনের ভাষ্য পড়ানো হয় (সম্ভবত এ পদ্ধতির উদ্ভাবক নদওয়াতু'ল-'উলামা'ই, অন্যরা পরে এর অনুসরণ করেছেন)। তাফসীরবিহীন আল-কুরআন ছাত্র-শিক্ষকের সামনে থাকে। শিক্ষক তাঁর অধ্যয়নের আলোকে ভাবার্থ পেশ করেন (এতে সরাসরি কুরআনী মহাজ্ঞান আহরণের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়)। অনেক বছর এ পদ্ধতিতে কুরআনের খেদমত করার তওফীক আল্লাহ্ আমাকে দিয়েছিলেন। তাফসীর পড়াবার অবকাশও হয়েছে। তবে মূল কুরআনই আমার দায়িত্বে ছিল অধিক সময় আর আমার দায়িত্বে অর্পিত অংশ ছিল অধিক তাফসীরসম্বলিত। এসব কথার অবতারণা করে আত্মপরিচয় দানের উদ্দেশ্য মাত্র একটাই আর তা হলো, অধম পবিত্র কুরআনের এক নগণ্য খাদিম। একথা আপনাদের অন্তরলোকে গেঁথে দেয়া। আমার পরবর্তী জীবনে যা কিছু (ভাঙা-চোরা) কাজ করেছি তার সবই মহান আল-কুরআনের অবদান।

(কবিতা) যা কিছু করেছ তা আল-কুরআনেরই দান।

আমার লেখা নগণ্য নিবন্ধাদি ও বই-পুস্তক যাঁরা পড়ে দেখেছেন তাঁরা অবশ্য লক্ষ্য করেছেন যে, আমার লেখার মালমসলা, তন্তু ও বুনন সবই আল-কুরআন থেকে আহরিত। সর্বাধিক ধার করেছি আমি আল-কুরআন থেকে, অতঃপর সাহায্য নিয়েছি ইতিহাসের। অবশ্য আমি ইতিহাসকে মনে করি আল-কুরআনের বিশ্বজোড়া ব্যাখ্যা।

ইজতিবা' সীমিত, হিদায়াত ব্যাপক

পঠিত আয়াতে দু'টি বিষয় বিবৃত হয়েছে। এক ঃ ইজতিবা' স্তর, দুই ঃ হিদায়াত স্তর। ইজতিবা' অর্থ মনোনয়ন, নির্বাচন ও বাছাইকরণ। এ বিষয়ে আল্লাহ্ পাকের বিধান হল নিযুক্তকরণ।

الله يجتبي اليه من يشاء'—"আল্লাহ্ যাকে মর্যী করেন তাকেই বাছাই করে নেন।" এটা আল্লাহ্র একান্ত অধিকার, যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি বেছে নিয়ে মনোনীত করে 'ইজতিবা' মর্যাদায় ভূষিত করেন।

কিন্তু হিদায়াত সার্বজনীন প্রয়োজনীয় বিষয়, তাই তা ব্যাপকতর এবং তাই তার বিধান হল—ويهدي اليه من ينيب'যারাই ধাবিত ও আকৃষ্ট হয়, হিদায়াত অন্বেষী হয়, নিজেকে অক্ষম, নগণ্য ভেবে বিনয় ও আগ্রহের সাথে যারা অগ্রগামী হয় আর আপনাকে করে দেয় তুচ্ছাতিতুচ্ছ, আল্লাহ্ পাক তাদের লাগিয়ে দেন পথ-পরিক্রমায়, পেঁ ছে দেন শেষ মনযিলে। কিন্তু তার জন্যে মূল শর্ত থাকে 'ইনাবাত' গুণে গুণান্বিত হয়ে আপনাকে নীচু করে মহান সত্তার পানে ধাবিত হওয়া। এ কথাটিই বিবৃত হয়েছে আয়াতে, যারা আকৃষ্ট ও ধাবিত হয় তাদের তিনি হিদায়ত দেন, পথ দেখান আল্লাহ্ পর্যন্ত পেঁ ছার। আমার আলোচনাও আজ এ বিষয়ে।

পবিত্র কুরআনের রয়েছে দুটি সম্পূরক ধারা ঃ প্রথমটি হল তার 'তা'লীম ও তাবলীগ অর্থাৎ সে সব 'আকীদা ও মৌল বিশ্বাসের আলোচনা যা অনুধাবন করা এবং যার প্রতি ঈমান রাখা প্রত্যেক মানুষের জন্য অপ-রিহার্য। আর তা আহরণ করতে হবে সরাসরি আল-কুরআন থেকে। কেননা এ বিষয়ে আল-কুরআনের দাবী হল—بلسان عربي مبين (সুস্পষ্ট প্রাঞ্জল আরবী ভাষায়) বরং আরও সুস্পষ্ট দাবী করে ঘোষিত হয়েছে—ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر "কুরআনকে অবশ্যই আমি সহজ ও প্রাঞ্জল করে দিয়েছি অধ্যয়ন-উপদেশ আহরণে, কেউ কি আছে উপদেশ গ্রহণে আগ্রহী?"

আল-কুরআন পাঠ করে কোন মানুষ মুশরিক হতে পারে না

কারো যদি একথা জানার আগ্রহ হয় যে, তার স্রষ্টা আল্লাহ্ তার কাছে কি দাবী করেন? তাঁর হিদায়াত প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বশর্ত কি কি? কুরআনে বিবৃত তওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের রূপরেখা কি কি? পৃথিবীতে

হিদায়াত ও আখিরাতে নাজাত লাভের রহস্য কিসে নিহিত? এসব প্রশ্নের সমাধানে আল-কুরআনের বর্ণনা সাবলীল ও প্রাঞ্জল। 'কুরআন থেকে এ বিষয়গুলি বুঝতে পারছি না, কাজেই কুরআন আমাদের জন্য দলীল নয়—' এ অভিযোগ উত্থাপনের কিংবা অপারকতা প্রকাশের অবকাশ দেওয়া হবে না কাউকে।

তওহীদ ও একত্ববাদ বিবৃত হয়েছে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতম, সবলতম ও উজ্জ্বলতম ভাষ্যে। দু'কথায় কোন বিষয় বুঝিয়ে দেওয়ার মতই বিষয়টি আল-কুরআনে বিদ্যমান। কাজেই কুরআন পড়ে আর যাই হোক, কেউ মুশরিক থেকে যাবে—এমন হতে পারে না। আমি সার্বজনীন ঘোষণা দিচ্ছি যে, কুরআন অধ্যয়নকারীরা ঠোকর খেতে পারে, বে'আমল হতে পারে, ফাসিক ফাজির হতে পারে, কিন্তু একত্ববাদ ও অংশীবাদ, তওহীদ ও শিরক্ বিষয়ে তাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কোন অবকাশ থাকতে পারে না। তওহীদ বর্ণনায় তো আল্-কুরআন দিবা সূর্য, না-বরং তার চাইতে সমধিক উজ্জ্বল। অনুরূপ রিসালাতের 'আকীদা। নবুওয়ত কিসের নাম? নবীগণের পরিচয় কি? তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি ছিল? কি করার জন্য তাঁরা আদিষ্ট হতেন? তাঁদের দেয়া শিক্ষা কি ছিল? তাঁদের জীবন-চরিত কেমন সুমহান ও সুপবিত্র হত? এসবের বর্ণনায়ও আল-কুরআন উজ্জ্বলতম গ্রন্থ। সুস্পষ্ট বর্ণনায় রয়েছে নবীগণের আত্মপরিচিতি এবং সাথে সাথে উত্থাপিত ও উত্থাপনকৃত মন্তব্য ও প্রশ্নসমূহের জওয়াব। পড়ুন সূরা 'আ'রাফ, সূরা হূদ, সূরা শু'আরা'। এসব সূরার নাম নিয়ে নিয়ে নবীদের পরিচিতি ও তাঁদের প্রদত্ত শিক্ষা তুলে ধরা হয়েছে।

যুক্তি ও বুদ্ধি বিচারকর্তা নয়; উকীল হতে পারে

আল-কুরআনে রিসালাত ও নবী-রসূলগণের আলোচনায় কোন ভ্রান্ত উপলব্ধির অবকাশ নেই। তবে একথা স্বতন্ত্র যে, কেউ যদি গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়, তাহলে এ পৃথিবীতে যুক্তি ও বুদ্ধি-বৃত্তির জোরে কত কিছুই না করা যায়! উপস্থিত সুধীবৃন্দের মাঝে এমন কোন তীক্ষ্ণধী বাকপটু থাকতে পারেন, যিনি এই রাতের বেলা দাঁড়িয়ে জোর গলায় দাবী করবেন যে, এখন তো রাত নয়, দিন চলছে এবং তা রৌদ্রো-জ্জ্বল দুপুর, এই তো সূর্য কিরণের তাপ ও দাহ অনুভূত হচ্ছে। হতে পারে যে, তিনি ক্ষুরধার যুক্তি ও গলার জোরে তার দাবী প্রমাণ করে দেবেন,

আমাদের সবাইকে করে দেবেন বোকা ও লা-জওয়াব। এটা হচ্ছে গলাবাজী ও বুদ্ধির খেলা। আদালতগুলিতে মামলা-মোকদ্দমায় এই ঘটে থাকে। দিনকে রাত আর রাতকে দিন বানিয়ে উকীলরা মামলায় জিতে যান। আমাদের উস্তাদ মাওলানা 'আবদুল বারী নদভী বলতেন, 'বুদ্ধি বিচারক (জজ) নয়—তা উকীল মাত্র, ফিস্ পেয়ে গেলে সে দাবী প্রমাণ করে যে কোন মামলা জিতিয়ে দিতে পারে। এজন্য পৃথিবীতে উদ্ভাবিত নতুন নতুন দর্শনগুলোকে—বুদ্ধি তার ক্ষুরধার যুক্তি দিয়ে এমনভাবে পেশ করেছে যে, যেন তা সর্বজনস্বীকৃত নিরেট বাস্তব। কাজেই কেউ যদি স্থির করে বসে যে, কুরআন থেকে ভ্রান্তি দাবী প্রমাণিত করবে, তাহলে তা স্বতন্ত্র ব্যাপার। একটা দৃষ্টান্ত নিন, ইসলামিক স্টাডিজ কনফারেন্স হচ্ছিল—স্থান ও ব্যক্তির নাম উল্লেখ করছি না—জনৈক প্রবন্ধ পাঠক তার প্রবন্ধে একথা দাবী করলেন যে, পবিত্র কুরআনে যতবার 'সালাত' (নামায) শব্দ উল্লিখিত হয়েছে তার অভিন্ন অর্থ হল 'আঞ্চলিক সরকার'। 'আর আস্-সালাতুল-উস্তা' (আসরের নামায) দ্বারা উদ্দেশ্য হল কেন্দ্রীয় সরকার। তিনি যুক্তি দ্বারা তার দাবী প্রমাণে সচেষ্ট হলেন। অবশেষে কঠোর ভাষায় আমাকে তা খণ্ডন করতে হল।

মহাজ্ঞানের চিরন্তন ভাণ্ডার; হিদায়াত প্রদানে সহজ আল-কুরআন

হিদায়াত লাভ ও পথ প্রদর্শনে আল্-কুরআনের সহজ হওয়া সন্দেহাতীত। কিন্তু তার অসীম জ্ঞান-ভাণ্ডার, তার সমুন্নত ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়মালা, সে সম্পর্কে কারো এ দাবী যে, সব কিছু বুঝেছি কিংবা এ অহমিকা, 'আমি যা বুঝেছি তাই ঠিক আর সব বাতিল'—এ দাবী অশ্রাব্য ও বাতুলতা-মাত্র। পবিত্র কুরআনের কোন বিষয়ে স্বতন্ত্র, একাকী ভিন্নমত পোষণ করা ভয়াবহ ব্যাপার। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর বাণী ঃ اى سماء تظلنى و اى ارض تقلنى اذا قلت فى كتاب الله ما لا اعلم 'ইয়া আল্লাহ্! পবিত্র কুরআনের কোন বিষয় সম্পর্কে ভিত্তিহীন কোন বাজে উক্তি করলে আমাকে ছায়া দেবে কোন্ আসমান? বহন করবে কোন্ যমীন?' কুরআন বিষয়ে সাহাবীগণের মন্তব্য ও আচরণ ছিল অনুরূপই। হযরত 'ওমর (রা) কোন শব্দ সম্পর্কে আত্মজিজ্ঞাসা করতেন ঃ এ শব্দের অর্থ কি? আবার নিজেই থমকে গিয়ে বলতেন—ثكلتك امك يا عمر 'ওমর! মরে যাও! তোমার মায়ের পুত্রশোক হোক! একটা শব্দের

অর্থ না জানা থাকলে তোমার বয়ে গেল কি? সাহাবায়ে কিরামের ভাবনা পদ্ধতি থেকে এ কথা সহজেই অনুমেয় যে, তাঁরা সঠিকভাবে কুরআনের মহাজ্ঞান আত্মস্থ করা 'সম্ভব' মনে করতেন না এবং তা জরুরীও ভাবতেন না। মহাত্মাদের এবং আল-কুরআন সম্পর্কে আমার এ মন্তব্য ও দুঃসাহস ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে বিবেচনা করবেন। আমি বলতে চাই যে, আল-কুরআনের যা আত্মা, যা তার মূল সুর, মূল দাবী ও মুখ্য উদ্দেশ্য তা হাসিল করা অপরিহার্য, আর কুরআনের সাথে আচরণ হতে হবে আদব ও বিনয়ের।

অনেক বিষয় এমন রয়েছে যার তত্ত্ব ও তথ্য আমাদের নাগালের বাইরে। কিন্তু তা ঐ সব বিষয় থেকে পরিপূর্ণ উপকার লাভের ব্যাপারে আমাদের জন্য অন্তরায় হয় নি। তাই কেউ যদি কুরআনের হাকীকত ও মূল তত্ত্ব এবং সুনিবিড় ও সুগভীর ভাবার্থ আহরণে অপারক হয়, এমন কি যদি শব্দগুলির শাব্দিক অর্থও অজানা থাকে, কিন্তু তার অন্তরে থাকে আল্লাহ্‌র ভয় আর তার আযাব-ভীতি, তার অবস্থা যদি এমন হয় যে, কুরআন তিলাওয়াতের আওয়ায তাকে করে সন্ত্রস্ত ও উদ্বেলিত যার বর্ণনা দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ্ পাক—

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ

—"পর্বতশৃঙ্গে নাযিল করা হলে এ কুরআন দেখতে পেতে বিনীত বিচূর্ণ তাঁর (আল্লাহ্‌র) ভয়ে" অর্থাৎ কুরআন শুনে তার গায়ের পশম কাঁটা দিয়ে ওঠে। সে হয় কম্পিত, তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে জাগে স্পন্দন ও প্রকম্পন আর সে বলতে থাকে, এ যে আমার মহান রবের (প্রতিপালকের) কালাম! এ যে আল্লাহ্‌র বাণী! এমন ব্যক্তি সম্পর্কে প্রায় সুনিশ্চিত এ আশা করা যায় যে, সে উপনীত হবে হিদায়াতের সর্বশেষ মনযিলে আর সে পেয়ে যাবে কুরআন সান্নিধ্য। হাদীছ শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ

"এমন কতেক লোকও হবে যারা কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করবে এবং তা করবে চরম ভণিতার সাথে। কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালীর নীচে প্রবেশ করবে না।" আগে উল্লিখিত হৃদয়বানেরা হবেন এদের থেকে স্বতন্ত্র।

মোটকথা, আল-কুরআনের বিষয়বস্তু ও অর্থ-ভাণ্ডার সম্পর্কে একজন ছাত্র হিসেবে আমি আরজ করতে চাই যে, তা এক অকূল সাগর যার বিশালতা ও প্রসারতা দেখে সকল শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও বরেণ্য মনীষীই প্রকম্পিত হয়ে উঠেছেন এবং এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত হিদায়াত ও তওফীক ব্যতিরেকে কেউ এ পথে এক পা-ও অগ্রগামী হতে পারে না।

সুবুদ্ধি ও জ্ঞান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসে

প্রথম কথাঃ কোন কিছু বুঝে ফেলা ও অনুধাবন করার শক্তি আসে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। আর পবিত্র কুরআনের ব্যাপারে এ উপলব্ধি হাসিল হয় সে সব বিশিষ্ট বান্দাদের, যাঁদের অন্তরে বিদ্যমান থাকে আল্লাহ্‌র ভয় এবং রব্বানী কালামের প্রভাব। অন্তর সজীব ও পরিপূর্ণ থাকে আল্লাহ্‌র বাণীর প্রভাব মাহাত্ম্যে। এসব অন্তরেই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতারিত হয়ে 'ইল্‌ম ও মহাজ্ঞান।

দ্বিতীয় কথাঃ নফল নামাযে কুরআন তিলাওয়াতের অভ্যাস করুন। কল্পনা করতে থাকুন, যেন হৃদয় মাঝে তা মুহূর্তে অবতীর্ণ হচ্ছে। তার স্বাদ আস্বাদন করতে থাকুন। তাতে বিলীন হয়ে যাওয়ার সাধনা করুন। কুরআন শরীফ মস্তিষ্ক-চর্চার ক্ষেত্র নয়, নয় কোন বুদ্ধির ব্যায়ামাগার। তাই সেখান থেকে কসরত করে নিজের পছন্দসই মতলব বের করার অপপ্রয়াস চালানো যেতে পারে না।

তৃতীয় কথাঃ অধ্যয়নকালে কুরআনের কোন অর্থ বা ভাবার্থ বুঝে আসলে তা এভাবে প্রকাশ করুন; আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে ও নগণ্য বুদ্ধিতে এ অর্থ উপলব্ধিতে আসে। এমন দাবী কক্ষণো করবেন না, আজ পর্যন্ত কুরআন বুঝতে সক্ষম হয়নি কেউ, আজই আমি তার রহস্য উদ্‌ঘাটন করলাম। এমন দাবী বাগাড়ম্বরমাত্র। একথা আমি বারবার বলেছি ও লিখেছি যে, বিগত তের শত বছর কেউ কুরআন বোঝেনি—এ দাবী পবিত্র কুরআনের বিপক্ষে বিরাট অভিযোগ। কেননা কুরআন তো দাবী করছেঃ بلسان عربى مبين প্রাঞ্জল আরবী ভাষায়। انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون ০ আর আমি নাযিল করেছি সাবলীল আরবী কুরআন যাতে তোমরা তা হৃদয়ংগম করতে পার। পক্ষান্তরে

আপনার দাবী হচ্ছে, হাজার বছরে বিগত শতাব্দীগুলোতে কুরআন পাকের অমুক শব্দটির রহস্য কেউ উদ্‌ঘাটন করতে পারেনি (আমিই তা করেছি)। এ দাবীর স্পষ্ট অর্থ হল এ যুগ-যুগান্তর ধরে কুরআনের অর্থ অনুধাবনের দ্বার রুদ্ধ হয়েছিল।

আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির এক সেমিনারের সমাপনী (সভাপতির) বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম, জ্ঞানসেবী ও গবেষকগণ তাঁদের গবেষণা এ ভূমিকাসহই পেশ করে থাকেন যে, আমাদের অধ্যয়ন ও গবেষণালব্ধ ফল এই যে, আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। যে কেউ তাঁর গবেষণার ফলাফল শতকরা এক শ' ভাগ নির্ভুল হওয়ার ব্যাপারে জিদ করে বসবে কিংবা সব ভিন্ন মতকে বাতিল ঘোষণা করে দেবে—এ পদ্ধতি যথার্থ ও স্বীকৃতিযোগ্য নয়।

আল-কুরআন হচ্ছে নিত্য নতুন ও অক্ষয় সজীবতার অধিকারী। তার অভিনবত্বের কোন সীমা-সরহদ নেই। হযরত নূহ (আ)-এর মত জীবন লাভ করে তা কুরআন অধ্যয়ন ও তার মর্ম অনুধাবনে ব্যয় করতে থাকলে প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন অর্থ উদ্‌ঘাটিত হবে। আমাদের জীবনের সীমিত সময় এবং সীমিত শক্তি ও যোগ্যতা সত্ত্বেও এ দাবী করা যে, ইতিপূর্বে কেউই কুরআন বুঝতে পারিনি—বাতুলতামাত্র।

আমার ব্যক্তিগত গ্রন্থ

শেষ ও মৌলিক কথাটি হল পবিত্র কুরআনকে একান্ত নিজস্ব কিতাব মনে করতে হবে। এ হচ্ছে চিরন্তন গ্রন্থ, আস্‌মানী কিতাব, কিন্তু সেই সাথে আমার ব্যক্তিগত গ্রন্থ, হিদায়াতনামা ও পথ প্রদর্শক। এতে দিক নির্দেশিত হয়েছে আমার দুর্বলতাগুলির, চিহ্নিত হয়েছে আমার রোগসমূহ।

যে কোন মানুষ আল-কুরআনের আয়নায় নিজের চেহারা দেখে নিতে পারে আর এ কাজটি করার জন্য পূর্বশর্ত হল একে জীবন্ত গ্রন্থ ও একান্ত আপন কিতাব মনে করা। নিজের ভিতরে আত্মশুদ্ধির উদ্দীপনা থাকতে হবে, অপরকে শোধরাবার কাজ পরে করা যাবে; প্রথমে নিজেকে শুধরে নিই। নবীগণের পদ্ধতি হচ্ছে, প্রথমে আত্মশুদ্ধি, পরে অন্যদের কিছু বলা। আমরা অনেকে কুরআন অধ্যয়ন করি তা দ্বারা অপরের সাথে হুজ্জত করার হীন উদ্দেশ্য নিয়ে, অন্যকে লজ্জিত করার মনোবৃত্তিতে। অথচ

সাহাবায়ে কিরাম কুরআন তিলাওয়াত করতেন আত্মশুদ্ধির নিয়তে। মাত্র এক আয়াত তিলাওয়াত করেই তার উপর আমল শুরু কর দিতেন। আর এজন্যই শুধু সূরা বাকারা সমাপ্ত করতেও অনেক সাহাবীর কয়েক মাস লেগেছিল।

একজন তালিব 'ইলম হিসাবে মনের কথাগুলো আপনাদের সামনে রেখে দিলাম يهدى اليه من ينيب (যারা আগ্রহ নিয়ে ধাবিত হয় তাদেরই তিনি হিদায়াত দেন)। এ ময়দানে যথাসাধ্য সাধনা করতে থাকি। আল্লাহ্ তাঁর মর্জি মুতাবিক কাউকে ইজতিবা' (মনোনয়ন) স্তরে উপনীত করবেন। সে স্তরের বাধ্যবাধকতা আমাদের জন্য নয়। আমরা যদি শিখতে চাই, হিদায়াত হাসিল করতে আগ্রহী হই, আত্মগঠনে উদ্গ্রীব হই, জীবনে বিপ্লব সাধন করতে চাই, তাহলে আমাদের জন্য রয়েছে পবিত্র কুরআন, যা আমাদের পথ দেখাবে এবং অবশেষে অভিষ্ট লক্ষ্যে (মনযিলে মকসূদে) পেঁাছে দেবে। আমাদের মাঝে থাকতে হবে হিদায়াতের চাহিদা, অভাবের অনুভূতি ও অসহায়ত্বের স্বীকৃতি ও আকুতি, আর এ সবের সমষ্টির নামই হচ্ছে ইনাদত, আল্লাহ্র প্রতি ঝোঁক, আল্লাহ্তে আগ্রহ। আমি দু'আ করছি, আপনারাও দু'আয় স্মরণ রাখুন ঃ

اهدنا الصراط المستقيم ○ صراط الذين انعمت عليهم ○ غير المغضوب عليهم ○ ولا الضالين ○

امين -

সরল সঠিক পুণ্য পন্থা মোদের দাও গো বলি,
চালাও সে পথে যে পথে তোমার প্রিয়জন গেছে চলি
যে পথে তোমার চির অভিশাপ, যে পথে ভ্রান্তি চির পরিতাপ;
মোদের কখনো করো না সে পথগামী
হে অন্তর্যামী!

দীনী 'ইলম-এর তালিব 'ইলম ও আলিমগণের জন্য তিনটি চিরন্তন শর্ত

তাং ১২ জুলাই, ১৯৭৮ ইং।
স্থান ঃ দারু'ল-'উলূম, কোরঙ্গী, করাচী, পাকিস্তান।
শ্রোতা ঃ দারু'ল-'উলূমের ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দ।

পরিচিতি পেশ ঃ দারু'ল-'উলূমের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব (র)-এর সুযোগ্য সন্তান পাকিস্তান ইসলামী গবেষণা পরিষদের সদস্য মাওলানা মুহাম্মদ তকী 'উছমানী।

মুফ্তী মুহাম্মদ শফী সাহেব (র) ও শীর্ষস্থানীয় আলিমগণের স্মরণে হাম্দ ও সালাতের পর।

দারু'ল-'উলূমের ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দ!

এ যুগের আলিম সমাজের মাঝে আমার মন যাঁদের গভীর পাণ্ডিত্য ও 'ইলম-এর দৃঢ়তায় বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাবনত, তাঁদের মাঝে বিশিষ্ট মর্যাদায় আসীন রয়েছেন এ দারু'ল-'উলূমের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা মুফতী শফী (র)। জ্ঞানের গভীরতা, ফিকহ ও ফতওয়ায় প্রসারিত সুগভীর দৃষ্টি, শিক্ষকসুলভ দক্ষতা—এসব গুণই মর্যাদা ও ইহতিরামের দাবীদার। কিন্তু এ সব ভিন্ন আরও একটি বিষয় রয়েছে যার কারণে কোন ফকীহ ও মুফতীকে ফাকীহ'ন-নাফ্স (জাত ফিকহ্বিদ) নামে আখ্যায়িত করা হয়। সমকালীন আলিম সমাজের মাঝে এ অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন হযরত মুফ্তী মুহাম্মদ শফী (র)। তিনি ছিলেন আমার উস্তাদগণের বয়স ও সারির বুযুর্গ। আমার দুর্ভাগ্য যে, সরাসরি তাঁর পাঠকক্ষে বসে তাঁর শিষ্যত্ব অর্জনের সুযোগ আমার হয়নি। আমি দেওবন্দের ছাত্র থাকাকালীন

যখন তিনি সেখানকার মুদাররিস ছিলেন, তখনও যেহেতু আমি শুধু দাওরায়ে হাদীছের সবকে শরীক হতাম, তাই তাঁর শাগরিদ হওয়ারসৌভাগ্য আমার হয়নি। বাইশ বছর পরে আজ এ মাটিতে পা রাখার সুযোগ হল। অথচ আজ তিনি আমাদের মাঝে নেই। ১৯৫৬-তে একবার বিদেশ থেকে ফেরার পথে দু'তিন দিনের জন্য করাচীতে অবস্থানের সুযোগ হয়েছিল। আল্লাহ্ পাকের শোক্‌র যে, তিনি আজ আমাকে মরহুম মনীষীর শ্রেষ্ঠ স্মারক দারু'ল-‘উলূমে পৌঁছে দিয়েছেন।

আজ পাকিস্তান অভাববোধ করছে হযরত মওলানা মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফী (র), মওলানা জাফর আহমদ উছমানী (র) ও ইউসুফ বিন্‌বী (র)-এর ন্যায় সুগভীর ‘ইল্‌মের অধিকারী ব্যক্তিবর্গের। পরিস্থিতি ও সমস্যা-সংকুলতার বিচারে প্রকট বাস্তব আজ এটাই যে, এ যুগের প্রয়োজন ছিল হুজ্জাতু'ল-ইসলাম ইমাম গাযালী, শায়খুল ইসলাম ইব্‌নে তায়মিয়া এবং হাকীমু'ল-ইসলাম শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ (র)-র ন্যায় মহান মনীষীবর্গের। আর ঐ ত্রয় জ্ঞানবীর ও দীনী রাহবারদের অনুপস্থিতিতে অন্তত নিকট অতীতের মনীষীত্রয়ের সমপর্যায়ের ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয়তা তো অবধারিত। কিন্তু আফসোস! আজ বিদায় নিয়েছেন তাঁরাও।

সময়ের বিবর্তনের অভিযোগ

প্রিয় ছাত্রসমাজ! আমি এখন কথা বলছি দারু'ল-‘উলূমে বসে। কাজেই আমার বক্তব্য হবে ‘ইলম সম্পর্কিত। ছাত্র-শিক্ষকগণের ভবিষ্যত, তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং সময়ের সংকট ও যুগের সমস্যা সম্পর্কিত। এ কথা আপনারা বারবার শুনে থাকবেন যে, যুগের পরিবর্তন হয়েছে, পৃথিবী বদলে গেছে, বদলে গেছে আসমান-যমীন, পরিবর্তিত হয়েছে চিন্তা করার প্রকৃতি ও ধরন। এমন একটি যুগে দীনী ‘ইল্‌ম হাসিল করার উদ্দেশ্যে সময় ক্ষেপণ, তাতে অভিজ্ঞতা অর্জন, তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় অনুধাবনে মস্তিষ্ক উত্তপ্ত-করণ হচ্ছে শীতকালে বাসন্তী সুরে বাঁশী বাজানো কিংবা পাহাড় খুঁড়ে কুটা সংগ্রহের তুল্য। কিন্তু মজার ব্যাপার হল এই যে, শুধু বর্তমান যুগেই নয়, বিগত সব যুগেও সময়ের বিবর্তনের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। যে কোন যুগের সাহিত্য ও কাব্য চর্চার ইতিহাস পড়ে দেখুন, সর্বত্রই শ্রুতিগোচর হবে একই কান্নার সুর। যুগ নষ্ট হয়ে গেছে, ‘ইল্‌মের কদর নেই, জ্ঞানী-দীনী

জনের মর্যাদা নেই, সর্বত্রই চলছে অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতার জয়জয়কার। আরবী কাব্য ও সাহিত্য অধ্যয়ন করুন। শুনতে পাবেন কবি আবুল ‘আলা' মু‘আররীর ফরিয়াদ:

تطاولت الارض السماء سفاهة
و فاخرت الشهب الحصا و الجنادل
و قال السها للشمس انت ضئيلة
و قال الدجى للصبح لونك حائل
و اذا نسب الطائى بالبخل مادر
و عير قسا بالفهاهة باقل

শেষে বলেন:

يا موت زر ان الحياة ذميمة
و يا نفس جدى ان دهرك هازل

নির্বোধ ধরণী অহংকার ভরা চোখে তাকায় আকাশ পানে,
কাঁকর বালুকণা কটাক্ষ হানে তারকার পানে;
ক্ষুদ্র নিষ্প্রভ তারকা কয়, সূর্য! তুমি অনুজ্জ্বল।
আঁধার রাত ডাকে অরুণ প্রভাতে, তোমার রং নিকষ কালো
ইতর বংশীয় বেটা অপবাদ ঝাড়ে হাতিম তাঈ! তুমি কনজুস
ক্ষেতুয়া (ক্ষেত চাষী) হাঁকে জ্ঞানবীরে, লজ্জা পাও হে অকাট নির্বোধ!
অবশেষে তাঁকে বলতে শুনি —
“মরণ! এসো হে তুমি, জীবন বড় বিষাদ পংকিল,
“আত্মা! সমঝে চল, কালের চোখে তুমি ‘এক পাত্র' উপহাসের
অর্থাৎ এ জীবন বিস্বাদ, এখানে মৃত্যুই শ্রেয়; আমার আত্মা!

আত্মমর্যাদা রক্ষা করে বাকী জীবন কাটাও, কারণ জ্ঞানীজনের অব-মাননার এ যুগে তুমি একটা উপহাসের পাত্রমাত্র। শুধু আরব কবিরই দোষ দিই কেন? ফার্সীর হাফিজ সিরাজীও তো ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন:

این چه شوریست که در دور قمر می بینم
همه أفاق پراز فتنه و شر می بینم

কালের বিবর্তনে দেখছি এ কোন উৎকট ফ্যাসাদ!
দিগদিগন্তে জয়জয়কার হাঙ্গামা আর অপকীর্তির।

আহম্মকদের মর্যাদা প্রাপ্তি ও জ্ঞানী সমাজের অমর্যাদার ছবি এঁকেছেন কবি সিরাজী তার পরের পংক্তিতে ঃ

اسپ تازی شده مجروح بزیر پالان
طوق زرین همه در گردن خر می بینم

শক্ত গদীর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত আরবী তাযী
গাধার গলায় ঝুল্‌ছে মণি-মুক্তা স্বর্ণহার।

এ তো গেল আরবী ও ফার্সীর কথা। আমাদের উর্দু জগতে আসুন। 'আবে হায়াত' ও অপরাপর কাব্যগ্রন্থে পাবেন অভিন্ন সোচ্চার প্রতিবাদ। কবি অশ্রু ঝরাচ্ছেন দেশ, কাল ও বিবর্তনের অভিযোগে। উস্তাদ 'যওক'-এর একটি পংক্তিই এ বিষয়ে যথেষ্ট মনে করি ঃ

پھرتے ہیں اہل کمال آشفتہ حال افسوس ہے
اے کمال افسوس ہے تجھ پر کمال افسوس ہے

অভিজ্ঞরা ঘুরে মরে দিশেহারা, দিগ্‌ভ্রান্ত,
নির্বোধেরা বাসা বাঁধে সুখের স্বর্গে।

আফ্‌সোস ! হায় আক্ষেপ রাখি কোথা ? আফ্‌সোস !

এ কয়েক লাইনে উদ্ধৃতি সংক্ষিপ্ত করলাম। অন্যথায় যুগের নামে অভিযোগ ও ফরিয়াদ করে রচিত কবিতায় ভরে রয়েছে কাব্যগ্রন্থের পাতার পর পাতা। যে কোন কিতাব উল্টিয়ে দেখুন। তাতে রয়েছে সময়ের অবিচারের আহাজারী, অভিযোগের স্তূপ। আর সে সবের মূল সুর একটাই। কার সামনে উপস্থিত করব জ্ঞান-ভাণ্ডার ? উজাড় করব অমূল্য বাণী ? কে বুঝবে রত্নের কদর ? কে দেবে অমূল্য সম্পদের যথার্থ মূল্য ? অপগণ্ড আর অযোগ্যদের প্রবল প্রতিপত্তির যুগে মানুষ কার জন্য করবে শ্রম সাধনা ? কেন পানি করে দেবে পিত্ত ? কলিজার খুন ঝরাবে কার স্বার্থে ? কিন্তু মনে রাখবেন, এসব অভিযোগ যদি আপনার মনে দাগ কেটে রাখে তাহলে আপনার রুচি হবে না মাদরাসায় অবস্থানের, ইচ্ছা হবে না মেহনত করে কিছু শিখতে।

আল্লাহ্‌র বিধান অপরিবর্তনীয়

আমি যা নিবেদন করতে চাই তা হল এই যে, কালের বিবর্তন একটি বাস্তব ও অনস্বীকার্য সত্য। এক শতাব্দী পেছনে তাকিয়ে দেখুন, কত খায়র ও

বরকতে (মঙ্গল ও কল্যাণ) পরিপূর্ণ ছিল সে যুগ, সে যুগের (বুযুর্গদের) বিশিষ্টদের কথা তো স্বতন্ত্র—সাধারণ লোকেরাও ছিল এ যুগের বিশিষ্টদের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। তাঁদের ঈমানী তেজ, ধর্মীয় মর্যাদাবোধ ছিল কত অধিক! দীনের 'ইলম হাসিল করা, নর-নারী নির্বিশেষে প্রত্যেকের হাফিজ-ই কুরআন হওয়ার প্রচলন কত ব্যাপক ছিল ! আজ প্রভাব বিস্তার করেছে উদাসীনতা ও বস্তুবাদ। ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে গেছে দীনী 'ইল্‌ম-এর অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনা। কিন্তু অতীতে সংঘটিত, বর্তমানে ঘটমান ও ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য এ বিবর্তন, যার গতি-প্রকৃতি আল্লাহ্ পাকই সমধিক অবগত, এর আবহমান ধারা সত্ত্বেও আমি বলতে চাই আল্লাহ্‌র বিধান অপরির্বতনীয়। যুগ বির্বতন সে বিধানের কোন রদবদল ঘটাতে পারে না। আল-কুরআন যে আয়াতে এ বিধানের ঘোষণা দিয়েছে তাতে পবিত্র কুরআনের অনুসৃত সাধারণ বর্ণনাশৈলীর ব্যতিক্রম করে বিষয়টির পুনরুল্লেখ ও পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে ঃ

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ
تَحْوِيْلًا -

আল্লাহ্‌র বিধানে তুমি কখনো রদবদল দেখতে পাবে না এবং আল্লাহ্‌র বিধানে তুমি কস্মিনকালেও বিবর্তন প্রত্যক্ষ করবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কামিল কুদরত ও পরিপূর্ণ বিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিশ্ব-জগত ও মানব 'ফিত্‌রাত' (স্বভাববিধি)-এর জন্য যে বিধিমালা নির্ণীত করেছেন, যে নীতি স্থির করে রেখেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত তাতে কোন রদ-বদল হবে না। আল্-কুরআনের পূর্বাপর অনুসন্ধানী ও হাদীছসমূহের সুগভীর অধ্যয়নের মাধ্যমে অবগতি লাভ করা যেতে পারে সেসব মৌলিক বিধানের। সে বিধিমালার তালিকা সুদীর্ঘ। আমার মত নগণ্য তালিব-ই 'ইল্‌মের পক্ষে সে তালিকা প্রদান সাধ্যাতীত। আর সময়ও সে উদ্দেশ্য সাধনে সংকীর্ণতর, তবুও আমার অসম্পূর্ণ বিদ্যার পরিসর হতে এমন তিনটি বিধানের উল্লেখ করছি যা আমাদের জীবন এবং আমাদের মাদরাসাগুলির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত।

উপকারীর মর্যাদার স্বীকৃতি

আল্লাহ্‌র বিধানসমূহের একটি হল কল্যাণকর ও লাভজনক বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, তার মর্যাদার স্বীকৃতি দেওয়া। উপকারী বিষয় এবং তার ক্ষেত্র ও কেন্দ্রের প্রতি আসক্তি, উপকারীর খোঁজে লেগে থাকা, তার দিকে ধাবিত হওয়া এবং তা পেয়ে গেলে তার কদর করা মানুষের স্বভাব। আল্লাহ্‌ পাক লাভজনক বিষয়ের স্থায়িত্ব, তার জীবন্ত থাকা ও সজীব থাকার গ্যারান্টি দিয়েছেন। লাভশূন্য বিষয়ের জন্য নেই এমন কোন গ্যারান্টি। সূরা আর রা'দ-এ এসেছে এ বিষয়ের সুস্পষ্ট ভাষ্য ঃ

فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال -

(বান বন্যায় ভেসে আসা) আবর্জনাগুলি বিলীন হয়ে যায় শুকিয়ে আর যা উপকারী (পানি) তা সঞ্চিত হয় ভূ-গর্ভে। আল্লাহ্‌ এভাবে দৃষ্টান্ত পেশ করেন লাভ-অলাভ এবং কল্যাণ-অকল্যাণের যাতে তোমরা তা অনুধাবন করতে পার।

একটি বিষয় লক্ষ্য করুন। 'অধিক উপযোগী' বলা হয় নি, বরং আল-কুরআনের পরিভাষা হল "উপকারী"। এ উপকারীর স্থায়িত্বের বিধান চলে আসছে লাখ লাখ বছর ধরে এবং হাজারো রকমের বিবর্তন সত্ত্বেও তা থাকবে অপরিবর্তনীয়। উন্নতি ও অগ্রগতি এবং গুরুত্ব ও মূল্যমানের স্বীকৃতি লিখে দেওয়া হয়েছে উপকারীর ললাটে। সুতরাং উপকারী সত্তারূপে গড়ে ওঠা নিশ্চয়তা দান করে অগণিত বিরুদ্ধাচরণ ও অসংখ্য বিবাদ মুকাবিলায় হেফাজতের। তার প্রয়োজন পড়ে না প্রচার-পাব্‌লিসিটির। কেননা খোদ উপকারী সত্তায় বিদ্যমান থাকে প্রেমাস্পদ হওয়ার গুণ এবং তাতে থাকে না স্থান-কাল-পাত্র ও দেশ-জাতির ব্যবধান। উপকারী যদি আত্মগোপন করে থাকে পাহাড় চূড়ায়, তবুও পৃথিবী তার সন্ধান পৌঁছে যাবে সে দুর্গম মন্‌যিলে আর তাকে সম্মানের সাথে বরণ করে তুলে নেবে মাথার উপর; বরং সাগ্রহে সাদরে অধিষ্ঠিত করবে চোখের মণিতে। এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র বিধান এবং হাজারো লাখো বছরের অলংঘনীয় অপরিবর্তনীয় বিধান।

উপকারীর চাহিদা ও সন্ধান

প্রিয় ছাত্রগণ! নিজেদের উপকার ও কল্যাণকররূপে গড়ে তোলার সাধনা করুন। জীবনচলার পথে আঁধার রাতের পথিকবৃন্দ! আপনাদের অস্তিত্বে লাভ করুক পথের দিশা ও আলোকবর্তিকা, আপনাদের সহায়তায় খুলে যাক 'ইল্‌ম জগতের জটিল গিঁট, সমাধান মিলুক দুর্লংঘ সমস্যার, আপনাদের সান্নিধ্যে সজীব ও প্রাণবন্ত হোক ঈমানী শক্তি।' আপনাদের সান্নিধ্যে এসে মানুষ আহরণ করে নিয়ে যাক একটা কিছু। এ ভাবে আত্মগঠনের পর আপনি যদি আপনার ও লোকদের মাঝে দেয়ালও তুলে দেন, কিংবা দরওয়াজা বন্ধ করে বসে থাকেন, তবুও এখানে একজন 'উপকারী' ব্যক্তি থাকেন, তাঁর দ্বারা অমুক বিষয়ে লাভবান হওয়া যায় (ঈমান ও আত্মার লাভ যা সমধিক গুরুত্বপূর্ণ।) এ তথ্য লোকজনের অবগত হওয়ার পর তারা দেয়াল টপ্‌কে কিংবা দরওয়াজা ভেঙে উপস্থিত হবে আপনার সমীপে।

এ বিষয়ে হযরত শাহ্‌ মুহাম্মদ ইয়া'কুব মুজাদ্দিদী ভুপালী (রা)-র একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। আল্লাহ্‌ পাক তাঁকে দান করেছিলেন জটিল ও সূক্ষ্ম বিষয়গুলি সহজ ও সর্বজনবোধ্য উপমা দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার বিস্ময়কর কুশলতা। একবার ফোরওয়াহ্‌'-র নওয়াব সাহেব তাঁর কাছে অভিযোগ নিয়ে এলেন---"হযরত! অনেক আগ্রহে অনেক সখ করে অনেক টাকা খরচ করে মসজিদ বানালাম, কিন্তু সেখানে নামায পড়তে আসেনা কেউ।" হযরতের সমাধান পদ্ধতি ছিল অভিনব। অনেক সময় তা রীতিমত পরীক্ষার বিষয় হয়ে যেত। তিনি জওয়াব দিলেন, "নওয়াব সাহেব! দেয়াল তুলে মসজিদের দরওয়াজা বন্ধ করে দিন। একেবারে বন্ধ ঘর বানিয়ে ফেলুন।" এতটুকু শুনতেই সাহেবের বুদ্ধি-বিভ্রম ঘটতে লাগল। তিনি ভাবলেন, এ যে উল্টো চিকিৎসা! বলতে লাগলেন---"হযরত! আমি মসজিদ বানিয়েছি লোকেরা তা আবাদ করবে ভেবে, অথচ আপনি বলছেন দরওয়াজা বন্ধ করে দিতে।" হযরত বললেন, "আমার পুরো কথা শুনে নিন, দরওয়াজা বন্ধ করে ভিতরে একজনকে বসিয়ে দিন পঞ্চাশ টাকার কিছু নোট হাতে দিয়ে; পঞ্চাশ না হয়ে দশ-পাঁচ টাকার নোট হলেও চলবে। বাইরে ঘোষণা করে দিন ঃ মসজিদে নোট বন্টন করা হচ্ছে। আপনি মসজিদ নির্মাণ করেছেন, কিন্তু লোকেরা জানে না নামাযের

ছওয়াব ও উপকারিতা। কাজেই তাদের মসজিদে আসার আশা করা যায় কি করে? নোটের অর্থ ও উপকারিতা তাদের জানা। তারা জানে পাঁচ টাকার নোট দিয়ে কত কত জিনিস সংগ্রহ করা যায়, কত কত কার্যোদ্ধার হয়। নামায দিয়ে কি কি কেনা যায়, কোন্ কোন্ বিষয়ে উপকৃত হওয়া যায়, তা তাদের অবগতির বাইরে। আর আপনি বসে আছেন শীত-গ্রীষ্মের কষ্ট উপেক্ষা করে, নিজেদের কাজের ক্ষতি করে দুর-দুরান্ত থেকে লোক মসজিদে উপস্থিত হবে সেই আশায়। এভাবে লোক বসিয়ে দেওয়ার পরে আর ঢোল পিটিয়ে প্রচার করার দরকার হবে না। অবিলম্বেই এ কথা (বাতাসে) ছড়িয়ে পড়বে যে, নওয়াব সাহেব কেন জানি মসজিদের দরওয়াজা বন্ধ করে দিয়েছেন, আর ভেতরে লোক বসিয়ে রেখেছেন টাকার নোটসহ। মনে হয় তা বাঁটা হচ্ছে। ফল দাঁড়াবে এই যে, লোকেরা দৌড়ে এসে দরওয়াজা ভেঙ্গে মসজিদে ঢুকে পড়বে, শত বাধা দিয়েও কেউ তাদের রুখতে পারবে না।"

মোটকথা, উপকারী হওয়াই মুখ্য বিষয়। যার ফলে লোকেরা ভিড় করতে থাকে পতংগের ন্যায়। পতংগদের এই কথা বলে দিতে হয় না যে, মোমবাতি জ্বালানো হয়েছে। কেউ কি কোন দিন এমন ঘোষণা দিয়েছে যে, পতংগকুল। বাতির উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়। পতংগ ও বাতির মাঝে সংযোগ কিসের? যেখানে পানির আভাষ পাওয়া যায়, সেখানেই সমবেত হয় পাখী ও পতংগ, ভিড় জমায় প্রাণী ও মানুষ। সুতরাং বিবর্তনের অভি-যোগ প্রমাণ বহন করে অজ্ঞতা, অনভিজ্ঞতা ও সাহসহীনতার।

'উপকারীর' যাদুকরী ক্ষমতা

আপনাদের একটি মজাদার ঘটনা শোনাচ্ছি। আমাদের লাখনৌ শহরে ডাক্তার আবদুল হামীদ (মরহুম) নামে একজন উচ্চশ্রেণীর ডাক্তার ছিলেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁর দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও বিশেষজ্ঞ হওয়ার স্বীকৃতি দিত হিন্দু-মুসলমান সব ডাক্তারই। তিনি আমাকে শুনিয়েছিলেন এ রসপূর্ণ ঘটনাটি। বারা-বাংকীর এক অমুসলিম ধনাঢ্য ব্যবসায়ী দেশ বিভাগের পর কটাক্ষ করে তাঁকে বলেছিল—ডাক্তার সাব! পাকিস্তানে পাড়ি জমাচ্ছেন না কেন? ডাক্তার সাহেব স্বাভাবিক স্বরে জওয়াব দিলেন—জী হাঁ, আমি তো ভারতে থেকে যাওয়ার মনস্থ করেছি। আল্লাহ্‌র কি মর্জী!

ব্যবসায়ী ভদ্রলোক কোন কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। বড় বড় ডাক্তার থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার চিকিৎসা চালানো হল। কিন্তু উপকার হল না কিছুই। ভদ্রলোক হার স্বীকার করে ডাক্তার হামীদ সাহেবকে অনুরোধ করে পাঠালেন। ডাক্তার সাহেব গিয়ে যখন চিকিৎসা শুরু করলেন তখন বললেন —আমি পাকিস্তানে পাড়ি জমালে কি করে আজ আমাকে ডেকে পাঠাতেন। আমিই বা কিভাবে আপনাকে সেবা করার সুযোগ পেতাম? আল্লাহ্‌র মর্জী, এ চিকিৎসায় তার রোগ মুক্তি ঘটল এবং তাকে লজ্জিত হতে হল।

আপনি যুগের কাছ থেকে আপনার কল্যাণকর ও উপকারী হওয়ার স্বীকৃতি আদায় করুন, সমকালীনদের এ কথা মেনে নিতে বাধ্য করুন যে, আপনার সঞ্চয়ে বিদ্যমান 'ইল্‌ম দুনিয়ার হাতে নেই। আমি মনে করি, এ পন্থা আপনার হাজারো সমস্যার সমাধান। যে দোকানে যে সওদা পাওয়া যায় তা কেনার জন্য সেখানে যাওয়াই পৃথিবীর নিয়ম। কোন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিও এমন অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে যাতায়াত করে যার কাছে মনের খোরাক এবং রোগের ওষুধ পাওয়া যায়। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) ছিলেন হাদীছ ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর যুগের ইমাম এবং বাগদাদে জনতার লক্ষ্যবিন্দু। কিন্তু মনের খোরাক ও আত্মার প্রশান্তি লাভের জন্য তিনি যাতায়াত করতেন শহরের এমন এক বুযুর্গের সোহবতে, যিনি 'ইল্‌মের মানদণ্ডে ইমাম সাহেবের ধারে-কাছেও ছিলেন না। একবার ইমাম সাহেবের এক ছেলে পিতাকে বলল—আব্বাজান! আপনি ওখানে যাতায়াত করলে সমাজে আমাদের মাথা নত হয়ে যায়। ইমাম সাহেব জওয়াব দিলেন, বৎস! সেখানে আমি প্রত্যক্ষ করি আমার অন্তর-জগতের কল্যাণ।

এই দরসে নিজামী—যার প্রভাব আজ বিশ্বব্যাপী, এর বিন্যাস করেছিলেন মুল্লা নিজাম উদ্দীন ফিরিংগী মহল্লী (লাখনবী)। তিনি ছিলেন গোটা ভারতের আলিম সমাজের উস্তাদ। এত জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও তিনি ছিলেন অযোধ্যার বাঁসা এলাকার বুযুর্গ হযরত সায়্যিদ আবদুর রাজ্জাক বাঁসাবী কাদিরী (র)-র মুরীদ। উক্ত বুযুর্গের শিক্ষার পরিধি ছিল প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত, কথা বলতেন আঞ্চলিক 'পূরাবিয়া' ভাষায়। মুল্লা সাহেব ঐ বুযুর্গের মালফূজাতও (বাণীমালা) সংকলন করেছেন। তাতে তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন ভক্তি ও শ্রদ্ধাপ্লুত ভংগীতে। এর কারণ হল এই যে, তিনি

নিজের মাঝে অনুভব করতেন এক শূন্যতা, যা পূর্ণ হবে ঐ দরবারে গেলে। সবার উস্তাদ হয়ে তিনি খুঁজে ফিরছিলেন এমন এক ব্যক্তিকে, যাঁর সান্নিধ্যে নিজের অযোগ্যতা ও "কিছু না হওয়ার" উপলব্ধি জাগে এবং আরো পড়বার, আরো শিখবার উদগ্র বাসনা সৃষ্টি হয়। দিল্লীর শাহ্ 'আবদুল 'আযীয (র.)-এর পক্ষ থেকে শায়খুল-ইসলাম খেতাবে ভূষিত হযরত মাওলানা আবদুল হাই বাড়ানূভী এবং হুজ্জাতুল ইসলাম খেতাবে ভূষিত হযরত মাওলানা শাহ ইসমা'ঈল শহীদ (র) সম্পর্ক জুড়েছিলেন হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র)-এর সাথে। অথচ সায়্যিদ সাহেবের শ্রেণীকক্ষের পাঠ সমাপ্ত হয়েছিল না। দেওবন্দ-এর মুরুব্বীদের বর্ণনা —সায়্যিদ সাহেব যখন এ এলাকায় শুভাগমন করলেন, তখন ঐ মহান দুই ব্যক্তির অবস্থা ছিল এই যে, সায়্যিদ সাহেব খাটে শুয়ে আরাম করতেন, আর তাঁরা দু'জন খাটের দু'ধারে বসে থাকতেন। সায়্যিদ সাহেব চোখ খুলে কিছু বললে তাঁরা দীর্ঘক্ষণ সে বাণী-চর্চা করে তার স্বাদ আস্বাদন করতেন।

স্বনির্ভরতা ও নিস্বার্থপরতার শক্তি অপরিসীম

দ্বিতীয় বিষয়টি হল আত্মনির্ভরতা ও স্বার্থত্যাগ। এটাও আল্লাহ্‌র অপরিবর্তনীয় বিধান যে, যারা হাত পাতে, মানুষ তাদের থেকে দূরে সরে যায়। যারা আঁচল পেতে ধরে, তাদের দেখলে মানুষ পালিয়ে যায়, আর যারা নিজের মুষ্টি বন্ধ করে রাখে, আঁচল গুটিয়ে রাখে, লোকেরা তাদের পদচুম্বন করে এবং খোশামোদ করে কিছু গ্রহণ করাতে পারলে ধন্য হয়ে যায়। অনাদিকাল থেকে আত্মনির্ভরতা ও স্বাবলম্বিতায় নিহিত রয়েছে আকর্ষণ ও জনপ্রিয়তা আর হাত পাতায় রয়েছে অপমান ও বেইয্‌যতী। যে স্বনির্ভর, সকলে তার মুখাপেক্ষী আর যে পরনির্ভর, সকলে তার প্রতি তোয়াক্কাবিহীন। আল্লাহ্‌র এ বিধানও চিরন্তন। সময়ের বিবর্তন তাতে আনেনি কোন পরিবর্তন। চতুর্থ শতকের ইতিহাস পড়ুন, সেখানে একই অবস্থা, ইতিহাস পড়ুন অষ্টম শতকের, সেখানেও বিরাজমান একই অবস্থা, আর আজকে এ চতুর্দশ শতকেও সে বিধি অপরিবর্তিত। সব যুগেই আপনি পাবেন অভিন্ন ধারার ঘটনাপঞ্জী। অধিক ঘটনা বা বিশদ বর্ণনার অবতারণা করতে চাই না। বুযুর্গানে দীনের জীবন-চরিত এবং তাসাওউফের ইতিহাস ভরা রয়েছে এসব ঘটনায়। এ বিষয়ে আপনাদের সম্ভবত রয়েছে

নিজস্ব অভিজ্ঞতা কিংবা আপনারা আপনাদের উস্তাদ ও মুরুব্বীদের কাছে শুনে থাকবেন তাঁদের উস্তাদ বুযুর্গানে দীনের ঘটনাবলী।

পরিপূর্ণতা অর্জন মর্যাদার চাবিকাঠি

তৃতীয় এবং শেষ বিষয় হল, সম্পূর্ণতা, অনন্যতা, পারদর্শিতা এবং কোন বিষয়ে পরিপূর্ণ দক্ষতা লাভ। ঊর্ধ্ব জাগতিক মহাজ্ঞান তো বটেই— জাগতিক শাস্ত্রীয় বিদ্যায়ও যদি কেউ পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারে ; বরং আরো নিম্নমানের ব্যবহারিক কোন বিষয়ে, যথা—হস্তাক্ষর শিল্প, বাইণ্ডিং শিল্পে দক্ষতা অর্জন করে তাহলে কত কত নামকরা বিদ্বানকে তাদের পিছনে ঘুরতে দেখা যায়। অনেক জ্ঞানী-গুণী-গ্রন্থকার, নামী-দামী পাবলিশার কাতিব (হস্তাক্ষর শিল্পী) ও কম্পোজিটরদের অন্যায় আবদার ও মান-অভিমান সয়ে যায়। তদুপরি তাদের অনুনয় ও খোশামোদ করতে থাকে। উদ্দেশ্য যথাসময়ে লেখাটি কমপ্লিট করে দেওয়া কিংবা অন্তত ব্লক তৈরীর উদ্দেশ্য গ্রন্থের নামটা আর্ট করে দেওয়া। কোন বিষয়ে অনন্য বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ কিংবা দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার অধিকারী কোন ব্যক্তিকে যদি আপনি দেখেন কিংবা তার বিষয়ে শুনতে পান যে, বেকারত্ব ও অসচ্ছলতার অভিশাপে ভুগছে, তাহলে অবশ্যই আপনাকে মনে করতে হবে যে, সে গুনবান ব্যক্তির মাঝে রয়েছে এমন কোন দুর্বলতা কিংবা স্বভাব দোষ, যা তার যাবতীয় গুণ ও যোগ্যতাকে পর্দাবৃত করে রেখেছে, তাতে পানি ঢেলে দিয়েছে। যেমন অতিশয় ক্রোধ, মেযাজের অস্থিরতা, অলসতা, পাঠদানে অমনোযোগিতা, কর্মবিমুখতা, নিয়ম ভঙ্গের অভ্যাস, পরমতে অসহিষ্ণুতা ইত্যাদি কিংবা আরও অধিক মারাত্মকরূপে সে কিছুটা উন্মাদ বা আধা-পাগল অথবা উত্তপ্ত স্বভাবের। তাই সে স্থির হতে পারে না কোথাও, ঝগড়া বাঁধিয়ে দেয় মুহূর্তে। নিশ্চিতই তার মাঝে বিদ্যমান থাকবে এ ধরনের কোন উপকরণ, যার পরিণতিস্বরূপ জগত তার কল্যাণ থেকে মাহরূম আর সে নিজে পরিত্যক্ত হয়েছে অবহেলা ও বিস্মৃতির অজ্ঞাত কোণে। এই হল সেই তিনটি চিরন্তন শর্ত ও গুণ, যার ব্যাপারে বিধান হল—যুগ ও যুগের বাসিন্দারা যতই বিগড়ে যাক, এ তিন গুণের যাদুকরিতা ও লোকপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ রয়েছে ও থাকবে। আমাদের মাদরাসাসমূহের ফারেগীন ও নববী 'ইলমের তালিব (ছাত্র)-গণকে পূরণ করতে হবে এ তিনটি শর্ত, তাদের হতে হবে এ গুণাবলীতে গুণান্বিত।

এ দীন চির জীবন্ত, জীবন্তরাই এর ধারক ও বাহক

(এ বক্তৃতা দেওয়া হয়েছিল করাচী দারু'ল-'উলুমের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ ইং-এর জুলাই ১৩ তারিখে। সমাবেশে উপস্থিতদের মাঝে ছিলেন দারু'ল-'উলুমের শিক্ষকবৃন্দ, ইন্তেজামিয়ার সদস্যবৃন্দ এবং দেশের বিভিন্ন এলাকার আলিমগণ ও শিক্ষিত সমাজ, আর ছিল এশীয় ইসলামী কন্‌ফারেন্‌স-এ আগত প্রতিনিধি দলের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য।)

হ'াম্‌দ ও সালাতের পর!

প্রিয় ছাত্রগণ ও সুধীবৃন্দ!

দীনের জন্য প্রয়োজন জীবন্ত ব্যক্তিত্ব

আমাদের এ দীনের জন্য আল্লাহ্‌ পাকের নির্ণীত, নির্ধারিত বিধি হল এই যে, এর জন্য অব্যাহতভাবে জীবন্ত ব্যক্তিত্ব জন্মলাভ করতে থাকবে। কোন গাছ সুফলা না হলে, তাতে নতুন নতুন পাতা-পল্লব অংকুরিত না হলে আর ফুল-কলি না ফুটলে তাকে জীবন্ত ও সজীব শ্যামল মনে করা হয় না। আমাদের এ দীনও জীবন্ত, জীবন্তদের জন্যই তা মনোনীত এবং জীবন্তদের অস্তিত্ব তার জন্য অপরিহার্য। আধ্যাত্মিকতার ময়দানে, 'ইল্‌ম ও চিন্তার জগতে এবং পরিচালনা ও নেতৃত্বের প্লাটফর্মে যারা জীবন্ত ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করতে পারেনি, তাদের ধর্ম বিলীন হয়ে গেছে, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মানুষের স্বভাব জীবিতদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া। বাতি প্রজ্জ্বলিত হয় বাতি থেকেই। অতীতেও তাই হয়েছে, আজও তাই হচ্ছে, ভবিষ্যতেই তাই হবে। সুতরাং এ উম্মতকে বাঁচতে হলে তার কর্তব্য জীবন্ত ব্যক্তিত্ব সৃজন করা, যেন তার 'ইল্‌মের গাছ, চিন্তাবৃক্ষ, সংস্কারবৃক্ষ এবং আধ্যাত্মিকতার মহীরূহ

সবুজ কিশলয়ে পল্লবিত হয়, নতুন ফুল প্রস্ফুটিত করে। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে : আমার উম্মত বৃষ্টিধারা তুল্য; কেউ বলতে পারে না তার প্রথম ফোঁটাগুলি মৃত ভূমির জন্য অধিকতর জীবনদায়ক কিংবা শেষের বিন্দুগুলি।

আমি একজন ইতিহাস লেখক। আমার অনুভূতি এবং রচনা ও সংকলন জীবনের অধিকতর অংশ অতিক্রান্ত হয়েছে ইতিহাসের অংগনেই। তাই আমি বলতে পারি, "এ মরু পরিক্রমায় কেটেছে আমার জীবন"। আমি বিশ্বাস করি যে, পূর্ববর্তীগণের অবদান, তাঁদের নিষ্ঠা ও সততা, পুর্বসুরীগণের 'আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক', তাঁদের অবিচলতা, তাদের কুরবানী ও আত্মত্যাগ উত্তরসূরীদের জন্য অমূল্য পুঁজি এবং জীবন ও জীবন-স্রোতের পয়গাম বাহক। 'আমাদের পূর্বসুরীগণ এমন বড় বড় বুযুর্গ ছিলেন', 'এত প্রখর ছিল তাঁদের মেধা ও স্মৃতিশক্তি', 'এত অধিক বিস্তৃত ছিল তাঁদের জ্ঞান-পরিধি', 'তাঁরা এহেন সুবিশাল, সুগভীর 'ইল্‌মের অধিকারী,' এসব কথা আমরা দাবী করে আসছি, স্বীকৃতিও দিয়ে আসছি। এসব সর্বান্তকরণে স্বীকার্য, কিন্তু তা যথেষ্ট নয় কখনো।

মৃতদের বদৌলতে 'ফয়েয' হাসিল হতে পারে, কিন্তু পথের দিশা পাওয়া যায় জীবিতদের কাছেই

আপনারা এমন ধারণা করবেন না যে, আমি বিগতদের সাথে অবিচার করছি। কেননা আমার সম্পর্ক সেই প্রতিষ্ঠান ও চিন্তাধারার সাথে, যাঁরা এ (ভারত) উপমহাদেশে ইসলামের ইতিহাসকে বিন্যাস দিয়েছে এবং উর্দু ভাষায় ইসলামের ইতিহাস সংকলনের সৌভাগ্য লাভ করেছে অর্থাৎ দারু'ল-'উলুম নদওয়াতু'ল-'উলামা এবং দারু'ল-মুসান্নিফীন (লেখক সংঘ)। কথাটি অন্য কেউ বললে আপনাদের এ মন্তব্য যথার্থ হত যে, বক্তা ইতিহাসে অনভিজ্ঞ, তাই ইতিহাসের প্রতি সে অবিচার করছে। শুনুন! আমি বলছি, আমাদের পূর্বসুরীদের যাবতীয় কর্ম ও অবদান সংরক্ষিত থাকা এবং সমুজ্জ্বলভাবে থাকা অপরিহার্য। আমাদের কর্তব্য বিগতদের অবদানের সাথে নতুন বংশধরদের পরিচিত করা এবং খুঁজে খুঁজে পুর্বসূরীদের কীর্তি ও অবদান সংগ্রহ করা। কিন্তু (আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য হল) কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী হওয়াই এ দীনের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র ফয়সালা ও সিদ্ধান্ত। সুতরাং তার জন্য অপরিহার্য জীবন্ত ব্যক্তিত্ব। আধ্যাত্মিক কার্যক্রমও সমাধা হয়

জীবন্ত বুযুর্গদের দ্বারাই। তাযকিয়া, আত্মশুদ্ধি এবং অধ্যাত্ম জ্ঞান আহরিত হয় জীবন্ত ব্যক্তিত্বের শিক্ষা-দীক্ষায়। তা পরিপূর্ণতায় উপনীত হয় তাঁদের সান্নিধ্যেই। এটাই মুহাক্কিক ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের সুফী-মাশায়েখদের গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত। অন্যথায় বিগতদের মাঝে তো এমন শীর্ষস্থানীয় বুযুর্গও ছিলেন, যাদের একজনই গোটা সমাজ ও উম্মতের জন্য যথেষ্ট হতেন। (কিন্তু তা হয় না। কেননা) মুহাক্কিকগণ বলেছেন ঃ জীবনে রয়েছে নিত্য রূপান্তর ও পরিবৃদ্ধি, জীবন সদা দোলায়মান ও পরিবর্তনশীল। এখানে আনা-গোনা চলে বিভিন্ন রঙ ও রূপের, পরিবেশ ও পরিস্থিতির। এখন রয়েছে এক বর্ণ, মুহূর্তে তা পরিবর্তিত হয়ে ধারণ করল নতুন বর্ণ। একটি ব্যাধির উপশমের সাথে সাথেই হয়ত দেখা দিল নতুন ব্যাধি। জীবন-সমৃদ্ধ বিশ্বের স্বভাব জগতের সাথে যাঁদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে তারা পথ দেখাতে পারেন না। এ দোলায়মান জীবন্ত মানব সমাজের ওঁদের কাছ থেকে ফয়েয (আধ্যাত্মিক সুষমা) লাভ করা যেতে পারে মাত্র। (অবশ্য ফয়েয হাসিলের নির্ধারিত পন্থায় ; কাজেই ভুল বোঝাবুঝির অবসান কাম্য।) কিন্তু পথের সন্ধান লাভ জীবন্তদের হাতেই সীমিত। কোন বংশধরদের কাছে যদি থাকে সব ধরনের সম্পদ, বড় বড় পাঠাগার, ইতিহাসের বিশাল সংগ্রহ, কিন্তু তাদের না থাকে এমন জীবন্ত ব্যক্তিত্ব যাঁদের অন্তর-চিন্তা, যাদের অনুসন্ধান ও উদঘাটন, যাঁদের বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানবত্তা দ্বারা আলো লাভ করতে পারে শুধু জীবিতরাই, তাহলে সে গোষ্ঠির বিলীন হয়ে যাওয়ার সমূহ আশংকা বিদ্যমান।

দীন সজীব হয়ে থাকবে

সহীহ্ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে ঃ

ان الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الامة امر دينها -

"আল্লাহ্ পাক প্রতি শতাব্দীর সূচনায় উত্থিত করতে থাকবেন একজন 'মুজাদ্দিদ' যিনি এ দীনকে রাখবেন তরতাজা ও সজীব, সংস্কার সাধনে সঞ্চার করবেন নতুন জীবনী শক্তি।" এ হাদীছের অর্থ এমন নয় যে, মুজাদ্দিদের আগমন মুহূর্তে তো দীনের দেহে নতুন প্রাণ এল কিন্তু বিশেষ সময় পর্যন্ত স্থায়ী হবে তার অস্তিত্ব।

من يجدد لهذه الامة امر دينها -

(যিনি উম্মতের দীনী ব্যাপারে সংস্কার সাধন করবেন) বাক্যাংশের অর্থ এমন নয় যে, তাঁর আগমনে দু'এক সপ্তাহ, দু'দশ দিন দীনের চর্চা হল, তারপর তিনি বিদায় গ্রহণ করলেন।

এ পর্যন্ত আগতদের জীবনী পড়ে দেখুন। কারো সংস্কার প্রভাব বিদ্যমান ছিল শতাব্দীব্যাপী আর কারো কারো তো কয়েক শতাব্দীব্যাপী।

আপনারা দেখে থাকবেন, রেল লাইনে মাঝে মাঝে একটি ছোট আকারের গাড়ী চলাচল করে। ওটার নাম 'ট্রলী' (লাইন চেকিং গাড়ী)। তার চলার নিয়ম হল, মানুষ তাকে ধাক্কা লাগিয়ে তাতে চড়ে বসে, তখন সে পিচ্ছিল লাইনের উপর আপন গতিতে চলতে থাকে। থেমে যাওয়ার উপক্রম করলে লোকেরা নেমে আবার ধাক্কা দিয়ে উঠে বসে। গাড়ী আবার চলতে শুরু করে। এ গাড়ী লাইন পর্যবেক্ষণের জন্য। উম্মতের গাড়ীও অনুরূপ মনে করুন। এ গাড়ীতে ধাক্কাদাতারা হলেন এ উম্মতের 'উলামা, মাশায়েখ এবং মুজাদ্দিদগণ। তাঁরা ঠেলে দিলে গাড়ী নিজের চাকায় গড়িয়ে চলে, অনবরত চালাতে থাকে না কেউ, গাড়ী চলবে তার চাকার যোগ্যতায়। কিন্তু ঠেলে দেওয়া এবং চালু করে দেওয়ার জন্য প্রয়োজন জীবনধারী মানুষ। কেননা, ওটা কোন টেক্‌নিক্যাল মেশিনারী বস্তু নয়; বরং জীবন্তরা ধাক্কা দিয়ে তা চালু করে দিলে সে নিজের চাকার ঘূর্ণনে চলতে থাকে। 'ট্রলী'তে জরুরী বিষয় দুইটি ঃ (১) বিছানো লাইনের মসৃণতা, চাকার ঘূর্ণন ও গতি এবং এগিয়ে চলার যোগ্যতা; (২) মানুষের কব্‌জীতে ঠেলতে পারার মত দৈহিক শক্তি। গাড়ীর যাত্রীরা থাকবে স্থির, অনড়। আমাদের এ উম্মতের ঐতিহ্যও অনুরূপ। যখন উম্মত শিকার হতে শুরু করে কার্যহীনতা ও বেকারত্বের, তখন আল্লাহ্‌র কোন বান্দা এসে তাকে ধাক্কা দেয়। সে তখন চলতে শুরু করে স্বকীয় গতিতে, আর এভাবে চলে যায় বেশ কিছু দূর।

হযরত মুজাদ্দিদে আল্‌ফেছানী (র) এবং হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র), উভয়কে আমি মনে করি এ যুগের মুজাদ্দিদ। আমি এ-ও মনে করি যে, আজ উপমহাদেশের যত স্থানে দীনী 'ইল্‌ম-এর চর্চা হচ্ছে, যত জায়গায় সুন্নতের দা'ওয়াত চলছে, শিরক ও বিদ'আতের প্রতি ঘৃণা এবং তা বর্জন ও উৎখাতের অভিযান চলছে, সেসবই ঐ দুই মনীষীর সাধনার ফল। দেখুন

তো, এমন একজন মনীষী এলেন, যার সজোর ধাক্কায় উম্মতের গাড়ীতে গতি সঞ্চারিত হয়ে তা অবিরত চলছে বিগত সাড়ে তিনটি শতাব্দী ধরে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন, আর চলবে কত দিন! অতঃপর আল্লাহ্র আর কোন বান্দা এসে ফের ধাক্কা লাগাবেন, তাতে চলবে আবার কতদিন। হযরত মুজাদ্দিদে আল্ফেছানী (র)-এর তিরোধানের দেড় শতাব্দী পরে আগমন ঘটেছিল হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ (র) এবং শাহানে দেহ্লী (দিল্লীর শাহ্) খান্দানের। তাদের কীর্তি ও অবদানের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেতে শুরু করেছে হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে। আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য হল একথা বলা যে, জীবন্ত ব্যক্তিত্ব সৃষ্টিই হচ্ছে মা'দরাসাসমূহের এবং আলিমগণের পবিত্র কর্তব্য।

পাকিস্তানের জন্য যা সর্বাধিক প্রয়োজনীয়

দারু'ল-'উলুম কোরংগীতে গতকাল আমি বলেছিলাম, পাকিস্তানের এখন সর্বাধিক প্রয়োজন এমন একটি আলিম সমাজ, যাঁরা সক্ষম হবেন আধুনিক সমস্যাগুলি অনুধাবন করে তার সমাধান পেশ করতে এবং কুরআন-সুন্নাহ ও শরীয়তের সহায়তায়, ফিকহ্ ও উসূলে ফিকহ্-এর আলোকে পথ প্রদর্শন করতে। অতএব অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের সাথে সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন হচ্ছে হযরত মুফতী মুহাম্মদ শফী, মাওলানা জাফর আহমদ উছমানী, মওলানা ইউসুফ বিন্নূরী (র) প্রমুখের ন্যায় গভীর প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব সৃষ্টির। তার পরে আমি বলেছিলাম, যুগ এত অগ্রগতি সাধন করেছে, বিপদ এত ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে এবং চ্যালেঞ্জ এত সুকঠিন হয়েছে যে, তার মুকাবিলার জন্য প্রয়োজন ছিল ইমাম গাযালী (র), ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) এবং হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ (র)-এর ন্যায় যুগস্রষ্টা মনীষীবর্গের। আর যদি হুজ্জাতুল ইসলাম গাযালী, শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া এবং হাকীমুল ইসলাম শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ (র)-এর সমপর্যায়ের লোক এ যুগে জন্মলাভ নাও করে, তাহলে অন্তত গড়ে উঠুক উপরে নামোল্লিখিত (নিকট অতীতের) মনীষীবর্গের সমতুল্য ব্যক্তিত্ব। সুতরাং মাদরাসাসমূহের দায়িত্ব হল এই যে, তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করবে বিশালতা, উদার ও গভীর দৃষ্টিভঙ্গী, চিন্তাধারার প্রসারতা ও ব্যাপকতা সৃষ্টির সাধনায়, অক্লান্ত সাধনা করবে কুরআন-সুন্নাহ্র রূহ ও আত্মার উপলব্ধি ও তার সাথে নিবিড় পরিচয় লাভের

মানসে এবং শরীয়তের যথার্থ লক্ষ্যসমূহের অবগতি লাভের উদ্দেশ্যে যাতে জাতির নবাগত কর্ণধারগণ জাতিকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারেন, যুগের বিবর্তন সত্ত্বেও। সমস্যার সমাধানে "কিতাবে দেখে নিন" বলা যথেষ্ট নয়। কেননা কিতাবগুলি তো লিখিত ও সংকলিত হয় যুগ-চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে। لا تبلى جدته و لا تنتهى عجائبه - "তার নতুনত্ব ফুরিয়ে যাবে না, তার অভিনবত্ব নিঃশেষ হয়ে যাবে না"—এ বৈশিষ্ট্য একমাত্র আল্লাহ্র পবিত্র কালাম আল্-কুরআনের। তার বাইরে মানব রচিত গ্রন্থমালায় মুদ্রিত থাকে রচনা-যুগের সুস্পষ্ট রূপ ও বৈশিষ্ট্য, সে যুগের ঘনীভূত প্রতিবিম্ব। যে কোন মহান গ্রন্থকারের গ্রন্থ খুলে দেখুন, আল্লাহ্ যদি আপনাকে দান করে থাকেন 'ইল্ম-এর রুচি, প্রজ্ঞা ও প্রতিভা, তাহলে রচনাশৈলী দেখেই আপনি সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন তা কোন যুগের রচনা। আপনি অনায়াসে বলে দেবেন, 'এ কিতাব তাতারী ফিতনার পূর্ব যুগের, এ খানি তার পরবর্তী যুগের, আর এখানি মনে হচ্ছে অষ্টম শতাব্দীর রচনা।' কেননা প্রতিটি যুগ, প্রতিটি শতাব্দীর বর্ণনাভঙ্গি, চিন্তাধারা ও স্তর বিভক্তি হয়ে থাকে স্বতন্ত্র।

আমি বলছি না যে, এসব মাদরাসা অহেতুক, অপ্রয়োজনীয়; বরং আমি বলছি, মাদরাসাগুলি একান্ত জরুরী এবং যথেষ্ট বরকতময়। আমরা সবাই নি'মাত ভাণ্ডারের মুক্তা-কণা সন্ধানী। আমিও এই যে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছি, তা মাদরাসারই ফয়েয, অবদান। আমার শিক্ষার আগা-গোড়া পরিসমাপ্ত হয়েছে এ পদ্ধতিতেই। কিন্তু তবুও আমি বলতে চাই (এবং আশা করি গুরুত্ব ও পরিমাণে বাড়াবাড়ি না করে যতটুকু বলতে চাই—আমার কথার ততটুকুই অর্থ করা হবে) যে, এই দীন জীবন্ত ধর্ম, তার জন্য চাই জীবন্ত মানুষ, জীবন্ত মানুষের স্পন্দনেই তার জীবনী শক্তি উজ্জীবিত হবে। পূর্বসূরী (বুযুর্গ)-গণের মাহাত্ম্য, শ্রেষ্ঠত্ব বিন্দু পরিমাণ কমিয়ে দেয়া আমার উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হচ্ছে একথাটা বলে দেওয়া যে, "বিগত মনীষীগণ একথা বলে গেছেন" এতটুকুতেই পরিতুষ্ট না হওয়া চাই।

ধরুন কেউ যদি আপনার কাছে মাসআলাহ জিজ্ঞাসা করতে এসে আপনার এ ওয়া'জ শোনে যে, "আমাদের মাঝে জন্মেছিলেন এতবড় মহান এক আলিম, যিনি ছিলেন 'ইল্মের আকাশ, 'ইল্মের পাহাড়"—তাহলে

বিরক্ত হয়ে প্রশ্নকর্তা বলে বসবেঃ জনাব! কূপে ইঁদুর পড়ে মরে রয়েছে, মহল্লার লোকেরা পেরেশান, শুধু বলুন কি করতে হবে? কত বালতি পানি তুলে ফেলতে হবে? আপনি যদি শুরু করেন, আমাদের মাঝে জন্মেছেন জগৎ-বরেণ্য ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম মুহাম্মদ (র), ইমাম যুফার (র), প্রমুখ, আর বলতে বলতে দম নেন আলবাহ্রু'র-রাইক, বাদাই 'উ'স-সানাই', ফাতাওয়া-ই-'আলিমগীরীর মুসান্নিফদের জন্ম লাভের কাহিনী বলে, তাহলে অধিকতর বিরক্ত হয়ে ভদ্রলোক বলে উঠবে, জনাব! সব সহীহ্, সব ঠিক হ্যায়। কিন্তু দয়া করে মাসআলাটি বলে দিন। নামাযের সময় হয়ে গেল, কূপ পবিত্র করার উপায়টা কি তাই বলুন। কোন উস্তাদ আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে এল, এবারতটি (লাইনটি) একটু বুঝিয়ে দিন, পংক্তিটির অর্থ করে দিন, আমি তা বুঝে উঠতে পারছি না। তখন যদি আপনি বক্তৃতা আরম্ভ করেন---"আমাদের পূর্বসূরীদের মাঝে জন্মেছিলেন অমুক অমুক সেরা সাহিত্যিক, যারা সর্বযুগে অতুলনীয় ছিলেন। আবদুল কাহির জুরজানী, আবূ 'আলী আল-ফারেসী, ইমাম 'আল্লামা যামাখ্শারী, 'আল্লামা হারীরী এবং অমুক অমুক কারী ও অগণিত জ্ঞানবীর মনীষী, (তখনো আপনার বক্তৃতা শেষ হয় নি, তাই বলতে থাকলেন) আর নিকট অতীতে এই ভারতের বুকে জন্মেছেন এমন এমন মনীষী যাঁদের কেউ পিছিয়ে নয় অন্যের তুলনায়।" উস্তাদজী সবিনয়ে আরজ করবেন, "জনাব! সবই ঠিক বলছেন, কিন্তু এ মুহূর্তে সমস্যা হল এই যে, ঘন্টা হয়ে গেছে, ছেলেরা অপেক্ষা করছে, আমি যাচ্ছি সবক পড়াতে। তাই মেহেরবানী করে তাড়াতাড়ি কবিতা পংক্তির মতলবটা (ভাবার্থ) যদি বুঝিয়ে দেন।" অনুরূপ অবস্থা যদি হয় প্রতিটি বিষয়ের যে বিষয়ের প্রশ্নকর্তা অমুক, আপনি তখন অনর্গল বক্তৃতা ঝেড়ে চলেছেন---"আমাদের শীর্ষ তালিকায় রয়েছে অমুক"—তাতে সমস্যার সমাধান আশা করা যায় কি?

গভীর প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্ব চাই প্রতিটি শহরে

সব দেশে বরং সব শহরে এমন সব গভীর প্রজ্ঞাসম্পন্ন আলিম থাকা প্রয়োজন, যাঁরা যথাসময় সহায়তা দিতে পারেন, পথ দেখাতে পারেন কিংবা অন্তত অন্য কোন অধিকতর যোগ্য আলিমের সন্ধান দিতে পারেন। আমিও অনুরূপ করে থাকি। কেউ কোন জটিল, গুরুত্বপূর্ণ মাসআলাহ জিজ্ঞাসা করতে এলে তাঁকে বলে দিই, আমাদের মাদরাসার মুফ্তী সাহেব রয়েছেন, তাঁর

কাছে জিজ্ঞেস করুন। لكل فن رجال প্রতিটি বিষয়ে প্রতিটি শাস্ত্রে স্বতন্ত্র প্রজ্ঞাবান রয়েছেন। মুফ্তী সাহেব ফিক্হ বিষয়ের লোক, মাসআলার জওয়াব তিনিই দেবেন নির্ভুল, পরিতৃপ্তিকর। (অবশ্য শাস্ত্রীয় ব্যক্তিরও কখনো কখনো বিচ্যুতি হতে পারে।) ইমাম ইবনে তায়মিয়া 'আল্লামা ইবনে হায্ম সম্পর্কে এক স্থানে লিখেছেন যে, তিনি তাঁর কিতাবে (হজ্জের) "সা'ঈ" (সাফা-মারওয়ার মাঝে দৌড়ানো) আদায়কালেও 'রাম্ল' এবং 'ইসতিবাগ'[১] বিধানের কথা লিখে দিয়েছেন (অথচ তা তাওয়াফের বিধান)। ইবনে তায়মিয়া (র) পরিপূর্ণ আদব ও বিনয়ের সাথে মন্তব্য করেছেনঃ হযরত ইবনে হায্ম (র) যেহেতু হজ্জ পালনের সুযোগ পান নি, তাই তাওয়াফ ও সা'ঈ তাঁর কাছে ঘুলিয়ে গিয়েছে। এ ধরনের বিচ্যুতি স্বতন্ত্র ব্যাপার (তা দু'একবার ঘটে যেতে পারে)। মোটকথা, যে-কোন বিষয়ে প্রজ্ঞাবান হতে হবে কিংবা তা প্রজ্ঞাবান পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হবে। তা না করে যদি আপনি বিগত মনীষীদের তালিকা পেশ করতে শুরু করেন, তাহলে তার দৃষ্টান্ত হবে এমন যে, পিপাসায় কাতর কোন ব্যক্তি আপনার কাছে এসে পানি পান করতে চাইল। আপনি বলতে শুরু করলেন, "মিয়া! পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে আছে কত পানগৃহ, সরাইখানা, আবিষ্কৃত হয়েছে কত কলজে জুড়ানো সুস্বাদু ইগ্লু, আইসক্রীম, আর মনমাতানো মজাদার স্কোয়াশ, শরবত ও পানীয়।" আমার কথা হল, পানীয় ও মিষ্টি শরবতের তালিকা পেশ করলে এবং তাকে পূর্বসূরীদের অগ্রগতির খবর পরিবেশন করলে তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে যাওয়া লোকটির কি উপকার হবে? তার দরকার একটু সাদা পানি, তা আপনি লোটায় করে দিন কিংবা মাটির পেয়ালা ভরে দিন (তাতে কিছু যায় আসে না)। এতেই কেবল নিভবে তার তৃষ্ণার আগুন।

শূন্যস্থান পূরণে প্রয়োজন জীবনপণ সাধনা

জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবনতি এবং জাতির অধঃপতন সংঘটিত হয় এভাবেই যে, বিদায়ী ব্যক্তির শূন্যস্থান পূরণ হয় না পরবর্তীদের দ্বারা। যিনি চলে যাচ্ছেন তিনি আসন শূন্য করে যাচ্ছেন, এটাই আজিকার মহাবিপদ। ভারতে আমরা আজ যে শূন্যতার শিকার, তার কথা আপনাদের কি আর বলব। (কারণ

---

১. হজ্জের জন্য তাওয়াফ করাকালে বিশেষ ভংগীতে (সামরিক বাহিনীর গতিভঙ্গী) হাঁটা এবং বিশেষ ধরনে চাদর পরার বিধান রয়েছে, এ ভঙ্গী ও ধরনকে 'রামল' ও 'ইসতি-বাগ' বলা হয়। ইহা তাওয়াফকালে—বিধিবদ্ধ সাফা-মারওয়ার সা'ঈ করার সময় নয়।

তা বলা আত্ম-অবমাননার শামিল,) কোন মাদরাসার শায়খু'ল-হাদীছের পদ খালি হল, কিন্তু আর তো শায়খু'ল-হাদীছ পাওয়া যাচ্ছে না। কোথাও-বা উসূলে 'ফিকহ' কিংবা অন্য কোন বিষয় পড়াবার লোক পাওয়া যাচ্ছে না। একটা কারণ অবশ্য বলতে পারি। আল্লাহ্‌র কতক বান্দা তো চলে এসেছেন এখানে (পাকিস্তানে) আর কতক গিয়েছেন আল্লাহ্‌র দরবারে। একদল ইন্‌তেকাল করেছেন, অপর দল 'মুন্‌তাকিল' (স্থানান্তরিত) হয়েছেন। আমাদের ক্ষেত্রে অবশ্য ফলাফল অভিন্নই হয়েছে। তাহলে আমার কথার উদ্দেশ্য ছিল, শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে, আর সেজন্য প্রয়োজন অবিরাম ও অক্লান্ত সাধনা। হাদীছের শ্রেষ্ঠ আলিম তৈরী করা কিংবা শ্রেষ্ঠ ফিক্‌হবিদ গড়ে তোলা যদি আপনার লক্ষ্য হয় তাহলে আপনাকে বুকের রক্ত পানি করতে হবে। কিন্তু আক্ষেপ! আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে আমাদের মাদরাসাগুলির ঐতিহ্য। এখানে আছে সব কিছুই, নেই শুধু মেহ্‌নত ও অখণ্ড শ্রমের বিগত ধারা। আমার মতে বাড়াবাড়ি হোক, সীমালংঘন হোক, তবুও বেখবর হয়ে, আত্মহারা হয়ে, ঘন্টা-মিনিটের হিসাব ভুলে গিয়ে অধ্যয়নে ডুবে থাকার ঐতিহ্য হোক পুনরুজ্জীবিত। য়ূরোপের উন্নতির পিছনেও লুকিয়ে রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন শ্রম ও অখণ্ড মনোযোগে লিপ্ত থাকার রহস্য। এ ধরনের অনেক ঘটনা আমি শুনেছি যে, গবেষণায় লিপ্ত ব্যক্তির সকাল-সন্ধ্যা, উদয়-অস্তের খবর পর্যন্ত থাকে না। আমার পরিচিত একজন ভদ্রলোক জার্মানী গিয়েছিলেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, সেখানকার কর্মজীবী একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি দিনের কাজ কখন আরম্ভ করেন এবং আপনাদের প্রতিষ্ঠান ক'টায় খোলে? "এই এক্ষুণি বলছি" বলে ভদ্রলোক ভেতরে গিয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করল, 'ভাই আমার সেকশন কখন খোলে?' ঐ লোক বলল ---টায়, তখন লোকটি ফিরে এসে বলল ----টায় আমাদের সেকশন খুলে থাকে। আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি নিজেই বলে দিলেন না কেন? সে জওয়াব দিল, "আমার তা জানা ছিল না। আমি তো খুব ভোরে আসি, তাই আমার সময় জ্ঞান থাকে না। তা ছাড়া ঘড়ি দেখার ফুরসত পাই না।" কর্ম-পাগলের কর্ম-প্রেরণা এমনই প্রবল হয়ে থাকে।

এখন যুগ চলছে বিশৃঙ্খলার, চারদিকে মনযোগ বিনষ্টকারী হৈ-চৈ। বর্তমানে এটা হচ্ছে মহাবিপদ। যেদিকে তাকাবেন, যে দিকেই থাকেন, দশ-বিশ-পঞ্চাশটি ব্যাপার এমন দেখতে পাবেন, যা অহরহ সৃষ্টি করে চলছে বিশৃঙ্খলা; দেখ্‌তে পাবেন এমন অবস্থা যা বিষায়িত করছে পরিবেশকে।

দেখ্‌তে পাবেন এমন এমন ছবি ও দৃশ্য, যা ছিনিয়ে নেয় মনের সব একাগ্রতা। আর টেলিভিশনের প্রোগ্রাম চলতে থাকলে তো কি আর বলব—"সুব্‌হানাল্লাহ্‌"! না, বরং বলুন "ইন্নালিল্লাহ"!

অতীতে সুবিধা ছিল এটাই যে, তখন মনোযোগ বিনষ্টকারী বিষয়ের আধিক্য ছিল না, আর মানুষের মাঝে ছিল আত্মনিমগ্ন হওয়ার অভ্যাস। আমার একজন মরক্কোবাসী উস্‌তাদ একবার একটা ঘটনা শুনিয়েছিলেন। মরক্কোর জনৈক আলিম মালিকী মযহাবের কোন গ্রন্থ সংকলন করছিলেন। দৈনিক দুপুরে বাড়ীতে গিয়ে তিনি দুপুরের খাবার খেয়ে আসতেন। একদিন তিনি বাড়ীতে না যাওয়ায় বাড়ীর লোকেরা তার কারণ জিজ্ঞেস করল। অবাক হয়ে তিনি বললেন: কেন, আমি তো এসেছিলাম, খানাও খেয়েছিলাম। পরে তার চিন্তা হল, ব্যাপারটা কি হয়েছিল? পরে জানা গেল যে, তিনি কোন মাসআলার বিষয় চিন্তা করতে করতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, পথে কোন বাড়ীর খোলা দরজা দিয়ে সে বাড়ীতে ঢুকে পড়েছিলেন। বাড়ীর লোকেরা ছিল অত্যন্ত সভ্য ও ভদ্র। তারা তাঁকে খাইয়ে দিয়েছে একথা টের পাওয়ার অবকাশ না দিয়ে যে, সেটা তাঁর নিজের বাড়ী নয়। বস্তুত সে যুগে আলিমদের মর্যাদা ছিল। ঐ বাড়ীর লোকদের সম্ভবত জানা ছিল যে, ইনি রোজ এ সময়ে বাড়ীতে গিয়ে খাবার খেয়ে আসেন। তারা চুপচাপ দস্তরখান বিছিয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন, ইনিও খানা খেয়ে রুমালে হাত-মুখ মুছে নিজের জায়গায় ফিরে এলেন। এত নিমগ্ন ছিলেন যে, সেটা যে তাঁর বাড়ী ছিল না, তেমন ভাববার কোন কারণ তার নজরে পড়েনি।

ইমাম গাযালী (র) এ ধরনের আর একটি ঘটনা লিখেছেন সম্ভবত তাঁর 'ইহ্‌য়াউ'ল-'উলুম গ্রন্থে। ইমাম শাফি'ঈ (র) একবার ইমাম আহমদ ইব্‌নে হাম্বল (র)-এর বাড়ীতে বেড়াতে গেলেন। বাড়ীর ছেলেরা ভাবল, আমাদের আব্বাকে তো প্রতি নামাযের পরে এ দু'আ করতে শুনেছি, "ইয়া আল্লাহ্‌! মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদ্‌রীস (ইমাম শাফি'ঈর নাম)-কে বাঁচিয়ে রাখ, তাঁকে সুস্থ রাখ এবং তার হায়াত দারায করে দাও।" ছেলেরা ভাবত, আমাদের পিতা হলেন এ যুগের ইমাম, তাহলে তাঁর উস্‌তাদ—যার জন্য এত দু'আ, তিনি যেন কত বড় বুযুর্গ হবেন! কৌতূহলী ছেলেরা একবার জিজ্ঞেস করে বসল: আব্বাজান! আপনি কার জন্য দু'আ করেন। পিতা জওয়াব দিলেন,

كالشمس للدنيا والعافية للبدن

তিনি পৃথিবীর জন্য সূর্যতুল্য (আলো দানকারী) এবং (পৃথিবীর মানুষদের) দেহের জন্য সুস্থতাস্বরূপ।

আজ সেই ইমাম শাফি‘ঈ (র) বেড়াতে এসেছেন তাদের বাড়ীতে। এরপর এক মজার ঘটনা ঘটল। বাড়ীর লোকেরা ভাবল, ঘরে বসেই অমূল্য রত্ন পাওয়া গেল। খুব আদর-আপ্যায়ন হল। রাতের খাবারের পর কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করে তিনি শয্যা গ্রহণ করলেন। ছেলেরা ভাবল, আব্বা দীর্ঘ সময় ইবাদতে অতিবাহিত করেন, ইনি তো আব্বার উস্তাদ! তাঁর তো চোখই বন্ধ হবে না সারারাত। সারারাত কাটিয়ে দেবেন ‘ইবাদাত-বন্দেগীতে। ছেলেরা ঐ সব ভেবে বদনা ভরে পানি রেখে দিল যাতে তিনি উঠে ওযু করে ‘ইবাদতে মশ্‌গুল হতে পারেন। কিন্তু হলো কি! ভোর পর্যন্ত তিনি শুয়েই থাকলেন। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) এসে তাঁকে নামাযের জন্য ডেকে তুল্‌লেন। তিনি উঠে ওযু না করেই নামায পড়তে চলে গেলেন। এসব দেখে তো ছেলেরা হতবাক! তাদের পায়ের তলার মাটি সরে যেতে লাগল, ইয়া আল্লাহ্! এসব কি হল? বদনী পরখ করে দেখা গেল, যেমন ছিল তেমনি পানি ভর্তি রয়েছে। বেশি হতভম্ব হল এ কারণে যে, ওযূ না করেই তিনি নামায পড়ে ফেললেন। কিন্তু সে যুগে যেহেতু প্রতিবাদ-প্রশ্ন উত্থাপনের প্রথা ছিল না, তাই কেউ কোন প্রশ্ন করল না। মজলিসে বসে ইমাম সাহেব ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র)-কে বললেনঃ আবূ আবদুল্লাহ্! (ইমাম আহমদের কুনিয়াত) আজ রাতে এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটেছে। তুমি আমাকে শুইয়ে দিয়ে চলে যাবার পর আমার মন চলে গেল অমুক হাদীছের দিকে। আমি হাদীছ থেকে মাসআলা উদঘাটন করতে শুরু করলাম। সারারাত মাসআলা বের করতে থাকলাম (মাসআলার একটি বিরাট সংখ্যাও তিনি উল্লেখ করলেন)। এসব মাসআলা উদঘাটন করতে করতে ভোর হয়ে গেল, ঘুমানো আর হল না।

کار پاکان را قیاس از خود مگیر - گرچه باشد در نوشتن شیر و شیر

“পূত-পবিত্রদের কাজের তুলনা করো না নিজের সাথে, অভিন্নরূপেই লেখা হয়ে থাকে শের (সিংহ) ও শীর (দুধ)।” অর্থাৎ আকৃতি ও ধরন-ধারণ এক হলেই দু’টি বিষয় সমতুল্য হয়ে যায় না। ফারসী ভাষায় সিংহ ও দুধ এ দুই শব্দ অভিন্ন আকৃতিতেই (**شیر**) লেখা হয়ে থাকে। অথচ **شیر** (শের) অর্থ সিংহ আর **شیر** (শীর) অর্থ দুধ (সকাল বেলা অপরের নিদ্রালু

চোখ দেখে চোর ভাবে লোকটা তারই মত আর একটা চোর আর রাত জেগে ‘ইবাদতকারী ভাবেন, ইনি একজন ‘আবিদ—অনুবাদক)।”

বর্তমানের কুধারণা পোষণের যুগ হলে তো পত্রিকায় হেডিং হত, “ওযূ বাদে নামায পড়ল যে আলিম” আর মজা করে প্রচার করা হত, এমন আলিমও রয়েছে যাঁরা ওযু ছাড়াই নামায পড়ে। শুধু তাই নয়—ইমামতিও করে (কারণ সে দিন ইমাম সাহেবের ইমামতি করারই অধিকতর সম্ভাবনা ; তাঁর উপস্থিতিতে অন্য কে আর নামায পড়াতে যাবে?)। আল্লাহ্ আমাদেরকে কুধারণা পোষণ থেকে রক্ষা করুন!

আল্লাহ্ পূরণ করে দিন আমাদের শূন্যস্থানগুলি। আমীন!

আকুড়া খটকে শহীদী খুনের বর্ণাঢ্য রূপ

(এ বক্তৃতা দেওয়া হয়েছিল আকুড়া খটকে অবস্থিত দারু'ল-'উলূম হাক্কানিয়ায় ১৯৭৮ ইং জুলাইর ১৯ তারিখে। শ্রোতা ছিলেন 'উলামা, উস্তাদগণ, ছাত্ররা এবং সুধীবৃন্দ। বিশেষ মেহমানের পরিচিতি পেশ করে ছিলেন দারু'ল-'উলূমের মুখপত্র মাসিক "আল-হক"-এর সম্পাদক মাওলানা সামী'উল হক)।

হাম্দ ও সালাতের পর——

'ইবাদতের জন্য কষ্ট স্বীকার করা

সম্মানিত সুধীবৃন্দ, বন্ধুগণ ও প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা! একখানি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে——"একদিন 'ইশার নামাযের সময় হয়ে গেলেও হযরত নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম হুজরা থেকে যথানিয়মে মসজিদে তশরীফ আনলেন না; বরং নিয়মের ব্যতিক্রম করে অনেক দীর্ঘ সময় হুজরায় অবস্থান করতে থাকলেন। মসজিদে উপস্থিত মুসল্লীগণ অপেক্ষা করছিলেন প্রবল আগ্রহে যে, যাঁর শিক্ষা ও বরকতে নামায চিনতে পেরেছি, তাঁরই পিছনে 'তাকওয়ার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মসজিদে' 'ইশার নামায আদায় করে বাড়ীতে গিয়ে আরাম করব। মুসল্লীরা ছিলেন শ্রমজীবী, মেহনতী মানুষের দল যারা পায়ের উপর পা রেখে বসে থাকতে অভ্যস্ত নন। ক্ষেতে বাগানে কিংবা বাজারে দোকানে সারাদিন মেহনত করাই তাদের দৈনন্দিনের রুটিন—মওসুম গরমের হোক কিংবা শীতের। গরমের হলে মদীনার গরমের কথা কে না জানে? কেমন ভাপেসা ত্বক পোড়ানো শরীর জ্বালানো সে গরম। সেই গরমে সারাদিন মেহনত করার পর এসেছিলেন জামা'আতে নামায আদায় করে বাড়ীতে গিয়ে আরামে ঘুমাবেন বলে।

কিন্তু আল্লাহ্র রাসূল তখনও তাঁর হুজরায়। লোকেরা কেউ ঝিমুতে লাগল, কেউ শুয়ে পড়ল; শ্রান্তি ও তন্দ্রাকাতর তখন সকলেই। হযরত 'ওমর (রা), যিনি ছিলেন উম্মাতের মুখপাত্র এবং অতি দয়াপ্রবণ ও স্নেহশীল, সকলের কষ্ট অনুভব করে তিনি হুজরার কাছে গিয়ে আওয়াজ দিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! শিশু ও মহিলারা ঘুমিয়ে পড়ছে।' নবীজী বাইরে তাশরীফ এনে সকলের উপর রহমের দৃষ্টি বুলালেন। ইরশাদ করলেন: নামাযের অপেক্ষায় জেগে থাকা লোক আজকের এ দিনে তোমরা ব্যতীত অন্য কোথাও কেউ নেই।" অর্থাৎ জাগ্রত তো কত লোকই রয়েছে। বসে বসে মজলিস গুলযার করা, গল্পগুজব করে আড্ডা জমানো কিংবা অন্য কোন কাজে-অকাজে কাটাবার জন্যও অনেকে জেগে রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভে নামায আদায়ের জন্য জেগে নেই আর কেউ।

ভারতবর্ষে ইসলাম

উপরের ঘটনাটি হিজরতের পর পরই ঘটেছিল কিংবা আরও পরবর্তী কোন সময়। তা যে সময়ই হোক এবং ঘটনার শরীকদের সংখ্যা যাই হোক না কেন——মূল্য ও মর্যাদা তো নির্ণীত হবে ধরন ও প্রকৃতি বিচারে, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মানদণ্ডে—সংখ্যা বা ভীড়ের পরিমাপে নয়।

অনুরূপভাবে ভারতবর্ষে ইসলামের আগমন কাল থেকে বিরামহীন ধারায় চলছে লড়াই ও যুদ্ধ, অর্জিত হয়েছে বিজয়ের পর বিজয় আর ঘটনা-চক্রে বিজয়ীরা প্রায় সকলে প্রবেশ করেছে আপনাদের এ এলাকা দিয়ে। এ বোলান গিরি আর খাইবার গিরিপথ ধরেই অগ্রগামী হয়েছে একের পর এক সেনাদল। আল্লাহ্ তাদের দান করুন উত্তম প্রতিদান। আমরা তাদের জন্য সদা দু'আপ্রার্থী——কেননা তাঁদেরই বদৌলতে ভারতভূমিতে উড্ডীন হয়েছে ইসলামের (কলেমা খচিত) পতাকা।

সিন্ধুর মুলতান পর্যন্ত আরবদের মাধ্যমেই ইসলামের অধিকতর প্রসার ঘটেছিল। এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইসলামের প্রতিপত্তি ও মাহাত্ম্য। এমন অনেক লোকও তখন ইসলাম গ্রহণ করেছে, যারা বস্তুজগতের স্বার্থ ও নতুন আহ্বানের লাভ না দেখে এক কদম এগুতে রাযী হয় না। পরবর্তীকালে তাদেরই বংশধরদের মাঝে জন্ম নিয়েছেন অনেক ওলী-দরবেশ এবং

আল্লাহ্‌ওয়ালা 'আলিম। সুতরাং আমরা বিজয়ী সেনানী ও রাজা-বাদশাহ্‌দের অবদান ও অনুগ্রহের কথা ভুলে যেতে পারি না। কেননা, আমরা তো হতে চাই সে জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত হতে যাঁদের পরিচিতি বিধৃত হয়েছে এ আয়াতে والذين جاؤو من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولاتجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رءوف رحيم অর্থাৎ (মদীনার) মুহাজির আনসারদের পরে যাদের আগমন হবে, যারা (তাদের দু'আয়) বলবে, "হে প্রতিপালক! আমাদের মাগফিরাত করুন এবং আমাদের সেই (দীনী) ভাইদেরও, যারা ঈমান সহকারে আমাদের অগ্রবর্তী হয়েছেন (ঈমান সহকারে পৃথিবীর বুক থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন।) আর (হে প্রতিপালক!) আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ স্থাপন করবেন না ঈমানদারদের প্রতি। ইয়া রব! আপনি স্নেহশীল দয়াবান।"

সুতরাং সুলতান মাহমূদ গয্‌নভী (কিংবা তাঁর আগেও যদি কোন সুলতান এদেশে অভিযান পরিচালনা করে থাকেন তাদের) থেকে শুরু করে এ পথে সর্বশেষ অভিযান পরিচালনাকারী আহমদ শাহ দুররানী (আবদালী) পর্যন্ত (যিনি ভারতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মারাঠাদের পরিচালিত সম্মিলিত শক্তির কোমর ভেঙে দিয়েছিলেন এবং মোগল রাজত্ব বরং মুসলমানদের প্রতিপত্তি ও সভ্যতা-সংস্কৃতির নিভুপ্রায় কুপিতে সামান্য সল্‌তে ও তেল ঢেলে দিয়েছিলেন যার ফলে আরো সত্তর-পঁচাত্তর বছর মুসমানরা এদেশে নিরাপত্তার শ্বাস নিতে পেরেছিলেন এবং ইসলামী প্রতিপত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মোটকথা, আমরা তাদের সকলের জন্যই কল্যাণের, কামিয়াবীর দু'আ করি এবং ইনশাআল্লাহ্‌ করতে থাকব ভবিষ্যতেও। যে পথে আগমন ঘটেছিল সেই দিগ্বিজয়ী বীরদের—সে পথও আমাদের প্রিয়। কিন্তু যে কথা একটু আগেই বলেছেন সামী'উল হক সাহেব এবং যথার্থই বলেছেন যে, আল্লাহ্‌র কলেমাকে বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে, শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধান, সুন্নত পুনরুজ্জীবিতকরণ ও মুসলমানদের জীবনধারাকে

শরীয়তসম্মত ধারায় ঢেলে সাজাবার লক্ষ্যে — ادخلوا فی السلم کافة 'ইসলামে প্রবিষ্ট হও পুর্ণাংগরূপে'—এ পয়গাম পৌঁছে দিয়ে তা বাস্তবে রূপায়ণ, শরীয়তের গণ্ডি সংরক্ষণ ও বিধি-বিধান বাস্তবায়নের ব্রত সাধনে, বহু শতাব্দীর পর ভারতের বুকে বরং গোটা ইসলামী বিশ্বে (ইতিহাস অধ্যয়নের আলোকে গোটা ইসলামী বিশ্বে হওয়ার দাবী অসংগত নয়), পূত পবিত্র নির্ভেজাল টক্‌টকে তাজা খূন যে মাটিকে নিষিক্ত করেছিল, তা আপনাদের এ এলাকার মাটি, আকুড়া খটকের মাটি। মিয়া মাজহার জানিজানাঁ-র-কবিতা তার যথার্থ চিত্র অংকন করেছেঃ

بنا کردند خوش رسمے بخاک و خون غلطیدن -

خدا رحمت کنند این عاشقان پاک طینت را

রক্ত ধুলায় লুটোপুটি করার এ মহান চির অম্লান রাজপথ রচেছিল যারা; পূত-পবিত্র সত্তা তাদের অবগাহন করুক আল্লাহ্‌র করুণা সাগরে।

জিহাদের শর্ত তিনটি

এখানে ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল সে জিহাদের, যার প্রচলন বিশ্বে প্রায় অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কোন রাজা-বাদশাহ্‌, কোন বিজয়ী বীর, কোন গাযী সেনানীর অভিযান সম্বন্ধে ইতিহাস এ কথার প্রমাণ দেয় না যে, যুদ্ধ শুরুর আগে প্রতিপক্ষের কাছে এ ঘোষণাপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা জিহাদের তিনটি শর্ত হিসাবে স্বীকৃত। ইসলাম বিঘোষিত জিহাদের তিনটি পূর্ব শর্ত হল—প্রথমত, প্রতিপক্ষকে এ ঘোষণা দেওয়া, "আমাদের ডাকে সাড়া দাও, ইসলাম কবূল করে নাও, তাহলে তোমরা হয়ে যাবে আমাদের ভাই; রক্ত সম্বন্ধের চাইতেও ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ অন্তর-সম্বন্ধের ভাই।" এদেশ সমর্পিত হবে তোমাদের হাতে। কারো অধিকার থাকবে না তোমাদের সাজানো-গোছানো বসতি, সুখের সংসার থেকে তোমাদের উৎখাত করার। কারণ আমাদের জিহাদের লক্ষ্য "মনিব বদল" বা "ক্ষমতার হাত বদল" নয়; বরং তা হচ্ছে দীন ও জীবনের, বিশ্বাস ও কর্মের ধারা বদল। অর্থাৎ বান্দা হওয়ার স্বীকৃতিতে আল্লাহ্‌র সাথে অংগীকারাবদ্ধ হলে তোমরাই হবে এদেশের অধিকতর অধিকারী। দ্বিতীয়ত, প্রথম প্রস্তাব তোমাদের কাছে মনঃপূত না হলে "জিযিয়া" প্রদানে স্বীকৃত হও, আমাদের করদ রাজ্যরূপে টিকে থাক, তখন আমরা তোমাদের হিফাজত করব। তোমরা থাকতে

পারবে অপরিবর্তিত অবস্থায়। তৃতীয়ত, দ্বিতীয়টি পসন্দ না হলে প্রস্তুতি নাও ময়দানে শক্তি পরীক্ষার। এ হল জিহাদের তিন শর্ত।

জিহাদের এ তিন শর্ত এতই সর্বজনবিদিত হয়ে গিয়েছিল যে, এর ব্যতিক্রম করার প্রেক্ষিতে সংঘটিত একটি অভিনব ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে 'বালাযুরী' লিখিত 'ফুতুহ'ল-বুলদান' গ্রন্থে। সমরকন্দ বিজয়ের সময় সেখানকার বাসিন্দারা অবগত হল যে, ইসলামে জিহাদ পরিচালনার কার্যক্রম হল প্রথমে দীনের দা'ওয়াত পেশ করা, অতঃপর জিযিয়ার প্রস্তাব দেওয়া এবং তা গৃহীত না হলে অবশেষে যুদ্ধ করা। সমরকন্দবাসীরা দেখল, ইসলামের দা'ওয়াত বা জিযিয়ার প্রস্তাব না দিয়েই ইসলামী বাহিনী সমরকন্দে প্রবেশ করেছিল। ততদিন দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, মুসলমানরা ঘর-বাড়ী বানিয়ে সেখানে বসবাস শুরু করেছে।

তখন খেলাফতের মসনদে আসীন ছিলেন উমাইয়া খলীফা হযরত 'ওমর ইবন আবদুল 'আযীয---ন্যায়পরায়ণতা ও ইসলামী বিধান পুনঃ বাস্তবায়নের মানদণ্ডে যাঁকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে পঞ্চম খলীফা-ই-রাশিদ-এর এবং তাঁর খিলাফত কালকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে খিলাফতে রাশেদার স্বর্ণ যুগের। বিজিত সমরকন্দবাসীরা ইসলামী জিহাদ-বিধি সম্পর্কে অবগতি লাভ করে এতদিন পরেও খলীফার ন্যায়পরায়ণতা ও শরীয়তের প্রতি তাঁর আনুগত্যের উপর ভরসা করে একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে দিল। প্রতিনিধি দল দরবারে খিলাফতে এসে খলীফার সমীপে অভিযোগ পেশ করল ঃ সমরকন্দ জয় করা হয়েছে ইসলামের জিহাদ বিধান ও নববী সুন্নাত লংঘন করে; আমরা এর প্রতিকার চাই।

খলীফা সেই মুহূর্তে চিঠি লিখলেন সমরকন্দের কাযীকে সম্বোধন করে, "এ চিঠি পাওয়া মাত্র আদালতের ইজলাস্ কায়েম করবে। ইজলাসে এ বিষয়ে সাক্ষ্য গ্রহণ করবে যে, মুসলিম বাহিনী ও তাদের সমরনায়ক সমরকন্দ জয় করার সময় জিহাদ বিধান পালন করেছিল কি না! যদি একথা প্রমাণ হয়ে যায় যে, "প্রথমে ইসলামের দা'ওয়াত, অতঃপর জিযিয়ার প্রস্তাব এবং তা অগ্রাহ্য হওয়ার ক্ষেত্রে লড়াই," এ ধারা প্রতিপালিত হয় নি, তাহলে মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করেই মুসলিম বাহিনীর সব সৈন্য সমরকন্দ ছেড়ে তার সীমানার বাইরে অবস্থান নেবে, অতঃপর ঐ সুন্নাত ও আদর্শ বিধি পালন করে প্রথমত, সমরকন্দবাসীদের ইসলামের দা'ওয়াত দেবে,

তারা তা গ্রহণ করলে তো উত্তম, অন্যথায় জিযিয়ার প্রস্তাব দেবে, তাও অগ্রাহ্য হলে তখন জিহাদ করতে পারবে।"

কাযী সাহেব দারুল খিলাফতের আদেশপত্র পাওয়া মাত্র আদালতের ইজলাস ডাকলেন এবং বিবাদীকে তলব পাঠালেন। মুসলিম বাহিনীর কমাণ্ডার-ইন-চীফ বিজয়ী সেনানায়ক আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। পৃথিবীর ইতিহাসে সম্ভবত এ ঘটনারও দ্বিতীয় কোন নজীর নেই। তরবারীর আঘাতে যিনি পদানত করলেন এত বড় দেশ, তুর্কিস্তানের রাজধানী শহর, সেই দুর্ধর্ষ সেনাপতি কিনা আসামীর কাঠগড়ায় একজন সাধারণ মুসলমানের বেশে দাঁড়িয়ে! মসজিদে ইজলাস বসেছে কাযীর আদালতের। বাদীপক্ষ বিজিত অমুসলিম। আসামীকে অভিযোগের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে কোন ভণিতা না করে সে স্বীকার করে নিল তার ভুল ও অন্যায়। সে বলল, "হ্যাঁ, মাননীয় আদালত! আমার দ্বারা এ ভুল সংঘটিত হয়েছে। বিজয়ের ধারাবাহিকতায়, অগ্রাভিযানের দ্রুতগতির ফলে গুরুত্বপূর্ণ জিহাদের ক্রমবিধান পালিত হয় নি।"

অভিযোগ প্রমাণিত হল। কাযীর নির্দেশ ঘোষিত হল, "মুসলমানরা শহর ছেড়ে চলে যাবে। শহরের অধিকার অর্পিত হবে মূল বাসিন্দাদের হাতে।" পরিস্থিতি কি হয়েছিল? অবস্থাটা কেমন ছিল? মুসলমানরা এখানে তৈরী করেছে তাদের বাড়ী-ঘর, ফসল ফলিয়েছে কৃষি ভূমিতে, অনেকে এখন এ শহরের স্থায়ী বাসিন্দা, কিন্তু সব ছেড়ে হাত ঝেড়ে শহর ত্যাগ করতে হল সবাইকে। অবস্থান নিতে হল শহর এলাকার বাইরে। শহরের বাসিন্দারা ছিল মূর্তিপূজারী, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী আর মুশরিক। তারা দেখল এ অভাবনীয় দৃশ্য। বিস্মিত হল আইনের শাসন দেখে, মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করল শরীয়তের বিধানের প্রতি মুসলমানদের আনুগত্য। আর অভিভূত হল ইসলামের 'আদ্ল ও ইন্সাফ দেখে, সামরিক বাহিনী প্রধানের বিপক্ষে শরীয়তের বিধান প্রযোজ্য হওয়ার দৃষ্টান্ত দেখে। ফলে তারা সম্মিলিতভাবে জানাল—যুদ্ধের আর প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই কোন হানাহানি কিংবা অস্ত্র প্রতিযোগিতার। আমরাও গ্রহণ করছি এ মহান ধর্ম ইসলাম, আমরাও ঘোষণা করছি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্। এই একটি ঘটনা ইসলামের সুশীতল ছায়ায় স্থান দিল সমরকন্দবাসী সকলকেই।

আমি বলতে চাইছিলাম যে, সে যুগেও মাঝে মাঝে জিহাদের সুন্নত পদ্ধতি অনুসরণে বিচ্যুতি দেখা দিত। আর পরবর্তী যুগে এ বিধান পালিত হওয়ার নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না। কারণ তখন তো সূচিত হচ্ছিল বিজয়ের পর বিজয়, বাহিনী এগিয়ে চলছিল অপ্রতিরোধ্য গতিতে। গ্রাম-গঞ্জ, শহর-বন্দর যা কিছু অগ্রাভিযানের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াত, সামরিক বাহিনী নির্দ্বিধায় পদানত করে এগিয়ে চলত। কিন্তু সুদীর্ঘ ব্যবধানের পরে এই নিকট অতীতে এসে পুনঃ বাস্তবায়িত হল সে বিধান মুজাহিদের হাতে। উপমহাদেশের জিহাদী আন্দোলনের নেতা সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র) এবং তাঁর সহকর্মী মাওলানা শাহ ইসমা'ঈল শহীদ (র)—যাঁকে বলতে পারেন প্রথমোক্ত জনের উযীরে আজম, প্রধানমন্ত্রী কিংবা ডান হাত কিংবা হাত-পা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—মুজাহিদ বাহিনীর কাযী, মুফ্‌তী এবং শায়খুল ইসলাম যাই বলুন। এ দুই মনীষী সে সুন্নত পুনঃরুজ্জীবিত করে জিহাদের ঘোষণা সম্বলিত চিঠি পাঠালেন লাহোরে (শিখদের কাছে)। সে চিঠির অনুলিপি আজও হুবহু উদ্ধৃত আছে বিভিন্ন গ্রন্থে। সেই মুজাহিদের রক্তে স্নাত হয়েই আজ এ যমীন হয়েছে সুসজ্জিত ফুল বাগিচা।

শহীদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না

শহীদের রক্ত বৃথা যায় না, তা প্রস্ফুটিত করে মনোহর ফল-ফুলের সমারোহে সুদৃশ্য বাগান—শুধু বাগানই কেন, শহীদের রক্তে জন্ম নেয় মাদরাসা মসজিদ, অস্তিত্ব লাভ করে খানকাহ এবং আরো অগণিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। শহীদের রক্ত ঝরানো মাটি হয়ে যায় অতি মাহাত্ম্যপূর্ণ। কারণ, তা যে শহীদের রক্ত স্নাত, মুজাহিদের তাজা খুনে নিষিক্ত। আপনাদের এ দেশ এ মাটি গর্ব করতে পারে এ কারণে যে, এখানেই প্রথম ঝরেছিল সে লাল লোহু, এখান থেকে শুরু হয়েছিল নবতর জিহাদের পথ-পরিক্রমা। আসার পথে আমি বন্ধুদের সাথে মুজাহিদ বাহিনীর প্রথম অভিযানের কাহিনী আলোচনা করছিলাম। আবদুল হামীদ খান নামে আমাদের রায়বেরেলীর এক খান সাহেব তালিকাভুক্ত ছিলেন আকুড়া খটকের নৈশ অভিযান পরিচালনাকারী মুজাহিদ দলে। ক্ষুদ্র দলকে নৈশ আক্রমণ চালিয়ে ছয় কিংবা দশ ক্রোশ (১৫-২০ মাইল) পথ অতিক্রম করে রাতে রাতেই ফিরে যেতে হবে মুজাহিদদের আস্তানায়।

সায়্যিদ আহমদ শহীদের সামনে তালিকা পেশ করা হলে তিনি আবদুল হামীদ খান নামের সামনে নিশান লাগিয়ে দিলেন। তাঁর জানা ছিল যে, খান সাহেব অসুস্থ ও দুর্বল। তাই তাকে অব্যাহতি দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। বললেন, 'আজই তো জিহাদ শেষ হয়ে যাচ্ছে না, সামনে রয়েছে জিহাদের বাসনা পূরণের অগণিত অবকাশ। এ পরিস্থিতিতে কোন সাধারণ লোক হলে মনে করত, জোর কপাল! নাম বাদ হয়েছে, আমাকে কিছু বলতে হল না, অথচ রেহাই পেয়ে গেলাম, বিপদ টলে গেল, আল্লাহ্ বাঁচায়। দশ হাজারের বিরুদ্ধে এ নগণ্য সংখ্যক মুজাহিদ যাচ্ছে অভিযান চালাতে, পথের চড়াই-উৎরাই জানা নেই। অভিজ্ঞতাবিহীন প্রথম বারের অভিযান, আল্লাহ্ই জানে কি কি প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হত। যাক! আমীরুল মু'মিনীন—প্রধান সেনাপতি নিজেই যেন রেহাই দিলেন। ভাগ্য ভাল! কিন্তু না, খান সাহেবের মন তখন বিভোর জিহাদের মাঠে অগ্রযাত্রার স্বপ্নে। তিনি হাতছানি দেখতে পাচ্ছেন শাহাদতের অবর্ণনীয় সফলতার। অসুস্থ অবস্থায় দৌড়ে এসে তালিকা থেকে বাদ পড়ার অভিযোগ জানালেন, জানতে চাইলেন—তা কোন্ অপরাধের শাস্তি? সায়্যিদ সাহেব জওয়াব দিলেন, "ভাই! আমি শুনতে পেলাম আপনি অসুস্থ ও দুর্বল। আপনার জ্বর হচ্ছে কদিন, আর অভিযানটিও সুকঠিন। এ জন্য প্রয়োজন অতি সহনশীল, অক্লান্ত সুস্থ সবল লোক।" খান সাহেব আরয করলেন,—"হযরত! নতুন ভিত্তি রচিত হতে চলেছে জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহ্‌র, আল্লাহ্‌র রাহে জীবন দানের। আজই তার প্রথম পদক্ষেপ, আমি কি মাহরূম থেকে যাব এ ভিত্তি রচনায় অংশ গ্রহণের সৌভাগ্য থেকে! আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমার নাম তালিকাভুক্ত করার অনুমতি দিন।" অবশেষে তাঁর নাম তালিকাভুক্ত হল। আল্লাহ্ পাক কবূল করে নিলেন তাঁকে। মুজাহিদের তালিকা থেকে তাঁর নাম স্থানান্তরিত হল শহীদানের তালিকায়।

দারুল উলূম হাক্কানিয়ার কথা

এ মাটিতে রচিত হয়েছিল উল্লিখিত কাহিনী, পরবর্তী ক্ষেত্র ছিল সাইদু (স্থানের নাম)। আপনাদের নিকটেই অবস্থিত সে স্থান। ক্রমান্বয়ে মুজাহিদ বাহিনীর তৎপরতা বিস্তৃত হল হিণ্ড, জাহাংগীরাহ প্রভৃতি স্থানে। এ সব নাম আমার স্মৃতিতে পরিচিত ও উজ্জ্বল। এ পথে আজ আমি প্রথম এলাম,

এর আগে পেশাওয়ার ও মর্দানের পথে আসার সুযোগ হয়েছিল আজ থেকে ৩৪-৩৫ বছর আগে। তখন এ দারুল উলুম প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সে বার এসে ঘুরে ফিরে চলে গিয়েছিলাম! কে জানত সে দিন আবার আসা হবে এ পথে এখানে? আমার জীবন সে সুযোগ দেবে! আল্লাহ্ আমাকে বাঁচিয়ে রাখবেন সে দিন পর্যন্ত! এসে দেখব এক সুশোভিত বাগান দারুল উলুম হাক্কানিয়াহ্, যেখানে জ্বলজ্বল করছে শহীদী ফুলের লাল আভা! 'হাক্কানিয়াহ্'-হক ও ন্যায় পথের পথিক; কি বাস্তব, কি সুন্দর সম্বন্ধ! কত মহান 'নিসবত'! এ সম্বন্ধ বর্ণাঢ্য হবেই ইনশাআল্লাহ্! শহীদানের খুন ধারণ করেছে মনোহর রং; এ সম্বন্ধও রঙীন হবে নয়ন জুড়ানো বর্ণে। নাম দেওয়া হয়েছে 'হাক্কানিয়াহ্'-হক ও সত্যের সাথে সম্বন্ধিত। ইন্‌শাআল্লাহ্ এখানে সত্য ও ন্যায় বাস্তবায়িত হবে। এ কেন্দ্র থেকে সূচিত হবে সত্যের অভিযাত্রা। এখানে শিক্ষা সমাপনকারিগণ হবেন সত্য ও ন্যায়ের পতাকাবাহী।

আল্লাহ্ পাক হায়াত দারায করুন ও জীবনে বরকত দিন শায়খু'ল-হাদীছ ও শায়খু'ল-'উলামা' হযরত মাওলানা আবদুল হক হাক্কানী সাহেবের। তাঁর চোখ জুড়াক ও মন আনন্দে ভরে উঠুক এ মাদরাসার উন্নতি ও অগ্রগতি দেখে। আল্লাহ্ সজীব ও শ্যামল রাখুন তাঁর লাগানো এ বাগানকে, এ কে করুন ফলে ফুলে সুশোভিত।

এখানে এ মাটিতে প্রয়োজন ছিল এমন একটি প্রতিষ্ঠানের, এমন একটি মাদরাসার, যেখানে গুঞ্জরিত হবে 'কালাল্লাহ্' এবং 'কালা'র-রাসুল'—আল্লাহ্‌র ইরশাদ এবং রাসূলের বাণীর সুমধুর আওয়াজ। কেননা, হিন্দুস্তান এবং আরো দূর-দূরান্ত থেকে হাতের মুঠোয় জীবন রেখে ধন-জন-সম্পদের মোহ কুরবানী করে সুদূর জিহাদ ভূমিতে পাড়ি জমিয়েছিলেন যাঁরা, তাঁরাও ছিলেন মূলত এ 'কালামুল্লাহ্' এবং 'কালামু'র-রাসূলের' সুদল, আর তাঁদের জীবনের লক্ষ্য ও ব্রত ছিল এ কালামুল্লাহ্ এবং কালামু'র-রাসূলই। এ মহান বাণী আর তার মহান লক্ষ্য তাদের করেছিল ঘরছাড়া, দেশহারা। ইন্‌শাআল্লাহ্! যতদিন এখানে এ মহান লক্ষ্যে মেহনত ও সাধনা অব্যাহত থাকবে, ততদিন বর্ষিত হবে আল্লাহ্‌র রহমত! কবির ভাষায়ঃ

هنوز آں ابر رحمت درفشان است - خم وخمخانه با مهر ونشان است

আজিও মুক্তা ঝরায় 'রহমতের' মেঘমালা; মদিরা ও আস্তানা বিদ্যমান আজিও সগৌরবে।

আস্তানা এখনো খালি হয়ে যায় নি, এখনো চলছে সেখানে রস-পিয়াসীদের আনাগোনা। শেষ ভাগে বলতে চাই কবি হাফিজের পংক্তিঃ

از صد سخن پیرم یک نکته مرا یاد است -

عالم نه شود ویران تا میکده آباد است

মুরশিদের শত বাণীর মাঝে একটি গেঁথে রয়েছে আজো মনের কোণে।
ক্ষয় ও লয় হবে না জগত, যাবত রয়েছে আস্তানা মদিরার।

অর্থাৎ, মা'রিফাত ও আল্লাহ্ প্রেম-এর শরাবখানা তথা বান্দার মনে মা'বুদের প্রতি প্রেম-আসক্তি সৃষ্টিকারী আস্তানাসমূহ, মাদরাসা-মসজিদ ও খানকাহসমূহ যতদিন তাদের অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকবে, 'কালামুল্লাহ্' ও কালামু'র-রাসূলের ধ্বনি গুঞ্জন তুলতে থাকবে, ততদিন প্রলয় ঘটবে না এ পৃথিবীর। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছেঃ পৃথিবীর বুকে যত দিন পর্যন্ত এমন একটি প্রাণীও বিদ্যমান থাকবে, যার মুখ থেকে উচ্চারিত হবে, আল্লাহ্! ততদিন পর্যন্ত মহাপ্রলয় তথা কেয়ামত সংঘটিত হবে না।

আপনাদের জানাই মুবারকবাদ, মুবারকবাদ জানাই এ পবিত্র ভূমিকে। আমি এখন আবেগাপ্লুত। কেননা এটা আবেগের সময়। কবির ভাষায়ঃ

تازه خواهی داشتن گر داغهائے سینه را -

گاهے گاهے باز خواں این قصه ها دینه را

"বুকের রক্ত ঝরানো ক্ষতগুলো, যদি রাখতে চাও তাজা রক্ত ভেজা,
রগড়াতে হবে তবে সে ক্ষত কভু,—বিগত দিনের ইতিহাসে আঁচড়ে।"

এ দারু'ল-'উলুম আপনাদের কাছে মর্যাদাপ্রাপ্তির দাবীদার। তার কদর করুন, গুণগ্রাহী হউন শিক্ষকবৃন্দ ও আলিমগণের। এখানে পাঠিয়ে দিন মেধাবী ছাত্রদের। কেননা আজ যা প্রয়োজনীয়, যেমন মাওলানা সামী'উল হক সাহেব ইঙ্গিত করেছেন, পাশ্চাত্যের ভয়াবহ ফিতনা, ভোগবাদ ও জড়বাদের ফিতনার মুকাবিলায় এগিয়ে আসতে হবে মেধাবীদের, যারা হবে উদ্যমী ও প্রেরণায় উজ্জীবিত, তারুণ্যে উচ্ছল, বংশধারায় শ্রেষ্ঠ। যাদের শিরায় শিরায় প্রবহমান রয়েছে মুজাহিদের শোণিত ধারা, শহীদের লোহু, আমানতদারের খুন, বিশ্বস্তদের রক্ত। এ বংশধরেরা অগ্রবর্তী হয়ে

কুরআন ও হাদীছের, কিতাব ও সুন্নাহ্‌র জ্ঞান আহরণ করে ছড়িয়ে পড়বে দু'পথের সঙ্গমস্থলে দাঁড়িয়ে থাকা এ দেশটির বুকে, যেখানে আজ চলছে হক-বাতিলের সংঘাত, সংগ্রাম চলছে ইসলামী বিধান পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে তার যুগোপযোগিতার, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে ফলাফল। তাঁরা ছড়িয়ে পড়বেন, আর পথ দেখাবেন পথসন্ধানী জাতিকে।

এখানেই সমাপ্ত করছি, এখানে এসে আমি কারো প্রতি অনুগ্রহ করিনি, কারো প্রতি করিনি কোন ইহ্‌সান; বরং আমি ইহ্‌সান করছি নিজের আত্মার উপর আর অনুগ্রহ লাভ করেছি উদ্যোক্তাদের, আমি ও আমার সফর-সঙ্গীগণ। কারণ উদ্যোক্তারাই ব্যবস্থা করেছেন স্মৃতির মণিকোঠায় উজ্জ্বল এ প্রিয় ভূমি আর একবার দেখবার।

যে মহান লক্ষ্যে এ প্রিয় ভূমি রক্তরঞ্জিত হয়েছিল, আল্লাহ্ তা ব্যাপক ও বিস্তৃত করুন। ইসলামের কলেমাহ্ বুলন্দ হোক। ইসলাম বিজয়ী হোক। ইসলাম বাস্তবায়িত হোক আমাদের ঘরে, আমাদের পরিবারে, আমাদের অফিসে, আদালতে, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানে সর্বত্র। দু'আ করুন যেন আল্লাহ্ পাক ফযল ও মেহেরবানী করেন।

اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ○

"ইয়া আল্লাহ! মদদ কর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু" আলায়হি ওয়াসাল্লামের দীনের সাহায্যকারীদের আর আমাদের করো তাঁদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ মদদ তুলে নাও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লামের দীনের সহায়তা বর্জনকারীদের থেকে আর আমাদের করো না তাদের অন্তর্ভুক্ত।"

আল্লাহ আমাদেরকে, আমাদের সকল বন্ধু ও প্রিয়জনকে সব রকমের দৈহিক ও আত্মিক রোগ-ব্যাধি থেকে সার্বিক শিফা দান করুন, সুস্বাস্থ্য ও সুস্থতা দান করুন! আল্লাহ আমাদের ইস্‌লাম ও লিল্লাহিয়্যাত (নিষ্ঠা ও আল্লাহ্‌তে নিবেদিত হওয়ার তওফীক) দান করুন। আমাদের কল্‌বগুলিকে নূরানী ও জ্যোতির্ময় করুন। দেমাগ ও মস্তিষ্ককে প্রখর ও উজ্জ্বল করুন। আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে শক্তি-সমর্থ্য দান করুন। আমাদের ভবিষ্যত বংশধর-দের ইসলামের উপর কায়েম রাখুন। আমীন! ইয়া রাব্বা'ল-'আলামীন!!

ইফাবা (রা)/৯০-৯১/৪০৪৭-৫২৫০/৩০-১১-৯০